ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে
বাংলাদেশী ওলামার অবদান

(১৯৭১-২০০৯)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক
মোঃ আহসান উল্লাহ
রেজিস্টেশন নম্বর : ৫২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Library
465979
465979
DIGITIZED

মার্চ- ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মোঃ আহসান উল্লাহ কর্তৃক **"ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশী ওলামার অবদান** (১৯৭১-২০০৯)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ, মৌলিক ও গবেষকের একক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য সন্তোষজনক। আমি পান্ডুলিপির আদ্যান্ত দেখেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

465979

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M. ull.

(ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশী ওলামার অবদান (১৯৭১-২০০৯)"** শীর্ষক থিসিসটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত থিসিসটি সম্পূর্ণরূপে বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

465970

(মোঃ আহসান উল্লাহ)
রেজিস্টেশন নম্বর : ৫২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে পেরে তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী মুহম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি। রূহের মাগফিরাত কামনা করছি বাংলাদেশের সে সব ওলামার যাঁরা ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রেখে গেছেন এবং সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি বাংলাদেশের সে সব ওলামার যাঁরা ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করে যাচ্ছেন।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন-এর প্রতি। তিনি আমার গবেষণার শুরু থেকেই নানাভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। তিনি পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন এবং মানোন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার অভিসন্দর্ভটিকে ত্রুটিমুক্ত, সাবলীল, সার্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য শ্রম ও সময় দিয়েছেন। আমি গবেষণা কাজে যখনই তাঁর নিকট গিয়েছি, তিনি কখনো বিরক্তবোধ করেননি; বরং শত কর্ম ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমার এ গবেষণার উন্নয়নের জন্য অনেক সময় দিয়েছেন; আমার বহু অস্বচ্ছ ও অজ্ঞাত ধারণাকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ জন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমার কাজে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহিত করেছেন এবং অনেকের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমার দ্বীনী ভাই জায়েদ মুন্সী, জাহাঙ্গীর আলম, মোবারক হোসেন, মোহাম্মাদ আলী ও সাজিদুর রহমান। পারিবারিকভাবে আমার পিতা মোঃ সানাউল্লাহ আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগার, মালিটোলা সমাজ কল্যাণ পাঠাগার ও আহলে হাদীস লাইব্রেরীর প্রতি। এ সব প্রতিষ্ঠানেব সমৃদ্ধ গ্রন্থ ভাণ্ডার থেকে আমি যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি, উপকৃত হয়েছি।

আরো যারা বিভিন্নভাবে আমাকে এ কাজে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

মোঃ আহসান উল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

(সাঃ)	: সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রাঃ)	: রাযি আল্লাহু 'আনহু
(আঃ)	: 'আলাইহিস্ সালাম
(রহঃ)	: রাহমাতুল্লাহি 'আল্লাইহি
তা. বি.	: তারিখ বিহীন
পৃ.	: পৃষ্ঠা
খ্রী.	: খ্রীস্টাব্দ
মৃ.	: মৃত্যু
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
P.	: Page
Vol	: Volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা..... ৮

[প্রথম অধ্যায়]

সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা

(ক) সংস্কৃতির পরিচয় ১১
(খ) ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ১২
(গ) মহানবী (সাঃ)-এর যুগে ইসলামী সংস্কৃতি ৩৪
(ঘ) খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ইসলামী সংস্কৃতি ৩৭
(ঙ) উমাইয়া যুগে ইসলামী সংস্কৃতি ৪৩
(চ) আব্বাসীয় যুগে ইসলামী সংস্কৃতি ৪৪
(ছ) ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি ৪৭
(জ) ইসলামী সংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতি..... ৪৮
(ঝ) ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ৪৯

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

এক. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ৫২
দুই. সংস্কৃতি চর্চায় বাংলাদেশী আলিমগণের চিন্তা ও মতের পার্থক্য ৫৬
তিন. বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশে আশু করণীয়

(ক) পরিবার ভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা ৫৭
(খ) মসজিদ ভিত্তিক সংস্কৃতির চর্চা..... ৫৭
(গ) প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার ৫৭
(ঘ) সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও সংগীতে ৫৮
(ঙ) দা'ওয়াতী কাজে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহার..... ৫৯
(চ) সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে গুরুত্বদান..... ৫৯
(ছ) শিল্পীদের সহায়তা প্রদান ৬০
(জ) ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের পথে আগ্রাসন চিহ্নিত করণ ৬০
(ঝ) সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন ঠেকাতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ৬১

[তৃতীয় অধ্যায়]

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশী ওলামার অবদান (১৯৭১-২০০৯)

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী..... ৬৪
মাওলানা আবদুল আলী ৭০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির দর্পণ। সংস্কৃতি সমাজের জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও জীবনবোধ থেকে উৎসারিত। কোন সমাজের জনগোষ্ঠী যখন এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হয়, রিসালাতের অনুসারী হয় আর এর ফলে তাঁদের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মানসিকতা, মননশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ সৃষ্টি হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রকাশিত ও বিকশিত হয় জাতির জীবনাচারে, শিক্ষায়, সাহিত্যে এবং শিল্পে। এগুলো হলো সংস্কৃতির বাহক। ইসলামী সংস্কৃতি একটি গাছ, ঈমান হলো তার বীজ। মু'মিনের আদর্শিক জীবনবোধ, জীবনাচার, সামাজিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, রসম-রেওয়াজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলায় এ সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। এ এক অনন্য অনুপম সংস্কৃতি। আদর্শিক প্রেরণাই এর প্রাণ। এ সংস্কৃতি সুন্দর পৃথিবী গড়ার নিয়ামক, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যম এবং পরকালীন সুখী জীবনের সহায়ক। নবী-রাসূলগণ ছিলেন এ সংস্কৃতির মডেল প্রচারক।

ইসলামী সংস্কৃতি প্রকৃতির দিক থেকে সমগ্র মানবতার উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করে আর মিশনের দিক থেকে তা সামগ্রিক ও বিশ্বজনীন। বংশ, গোত্র এবং দেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানব জাতির ঐক্যের কথা তাতে রয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতিতেই একটি স্বচ্ছ, গতিশীল জীবন-চেতনার পরিস্ফুটন ঘটে। এতে কোন সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী নেই। এটি একটি উন্নত, যুক্তিবাদী ও সদা কল্যাণধর্মী চেতনা বিকাশের মূলভিত্তি। সৎ কর্মের প্রতি অনুরাগ, অসৎ কর্মের প্রতি বিরাগ এবং স্রষ্টার প্রতি ঈমান- এটাই ইসলামী সংস্কৃতির মূল। ইসলামী সংস্কৃতি বিজ্ঞান ভিত্তিক। সুস্থ জীবন, সমাজ-সভ্যতার নির্মাণ ও বিকাশে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট অতিশয় সুস্পষ্ট। শুধু মুসলিম সমাজে নয় বরং সমগ্র বিশ্ব সভ্যতা ও মানব সংস্কৃতির বিকাশে ইসলামী সংস্কৃতির কম-বেশি প্রভাব সুস্পষ্ট।

বর্তমানে এ বিষয়টি সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর সম্যক জ্ঞানার্জন সর্বাধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। যে জাতি গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যের অধিকারী, যারা বর্তমানে সংকট ও অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন, নিজস্ব ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করে সচেতন হওয়া তাদের জন্য এ মুহূর্তে আরো বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

ইসলামের সাথে আলিমদের সম্পর্ক যেমন গভীর তেমন দৃঢ়। যখনই ইসলাম বিপদগ্রস্ত হয়েছে এবং আলিমগণ সঠিকভাবে তা উপলব্ধি করেছেন, তখনই তাঁদের অনেকে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ মানবিক ব্যর্থতার উর্ধ্বে না থাকা সত্ত্বেও দ্বীনের পবিত্রতা রক্ষা করেছেন এবং ইসলামের সংরক্ষণে নিজেদেরকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভাসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলিম জাতি তাঁদের সংস্কৃতি ভুলে যেতে বসেছে। তাই তাঁদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে যথাযথ অবহিত করা এবং ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশের ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে যে মহান ভূমিকা রেখেছেন তা উপস্থাপন করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ অভিসন্দর্ভে ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ, ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা আরো জোরদার করার দিক-নির্দেশনা সম্যকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর বর্তমান প্রজন্মকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য অতীতে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের দ্বারা বাংলাদেশকে একটি সুশীল, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়তে এ দেশের ওলামায়ে কিরাম কত চমৎকার ও প্রশংসাযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভটি পাঠে দিশেহারা তরুণ-তরুণী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এ অনুভূতি জাগ্রত হবে যে, তাঁদের অভিভাবক ওলামায়ে কিরাম কত সচেতন, যত্নশীল ও স্নেহশীল ছিলেন। তাদের ভবিষৎ কল্যাণের জন্য সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশে তাঁরা কতটা চেষ্টা সাধনা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। যারা ইসলামী চেতনা সম্পন্ন হয়েও বর্তমানে নানা হীনমন্যতা ও হতাশায় ভুগছেন এর মাধ্যমে তাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, ইসলামী সংস্কৃতি দু' ধরনের। এক. স্থায়ী সংস্কৃতি- যেমন, মণীষীগণের লেখা বই-পুস্তক। দুই. অস্থায়ী সংস্কৃতি- যেমন, মানুষের আচার-অনুষ্ঠান, ইত্যাদি। এ অভিসন্দর্ভে উভয় প্রকার সংস্কৃতির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

মোঃ আহসান উল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

[প্রথম অধ্যায়]

সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা

(ক) সংস্কৃতির পরিচয়
(খ) ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য
(গ) মহানবী (সাঃ)-এর যুগে ইসলামী সংস্কৃতি
(ঘ) খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ইসলামী সংস্কৃতি
(ঙ) উমাইয়া যুগে ইসলামী সংস্কৃতি
(চ) আব্বাসীয় যুগে ইসলামী সংস্কৃতি
(ছ) ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি
(জ) ইসলামী সংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতি
(ঝ) ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা

(ক) সংস্কৃতির পরিচয়

সংস্কৃতি শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে কালচার, কৃষ্টি, তমদ্দুন, মার্জনা, পরিশীলন, পরিমার্জনা, অনুশীলন, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, রুচিশীলতা, রুচি, সুরুচি।[১] এর অর্থ সংস্কার, উন্নয়ন, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, রীতিনীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, কালচার। 'সংস্কৃতি' শব্দটি 'সংস্কার' শব্দ থেকে উদ্‌গত হয়েছে। 'সংস্কার' শব্দের অর্থ : বুদ্ধি, শোধণ, পরিস্কার বা নির্মল, উৎকর্ষ সাধন, সংশোধন, ধারণা বিশ্বাস সংস্কার।[২]

সংস্কৃতি শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো culture. (বাংলা একাডেমী ১৯৯৩ আগষ্ট প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী ইংলিশ-বেঙ্গলী ডিকশনারী' এ অভিধানে) কালচার অর্থ : সংস্কৃতি, মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ। একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা। কোন জাতির বিশেষ ধরনের মানসিক বিকাশ। কোন জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প সাহিত্য বিশ্বাস সমাজনীতি।[৩]

আরবী ভাষায় সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে দুটি শব্দে প্রকাশ করা হয়। একটি হলো 'সাকাফা' আর অপরটি হলো 'তাহযীব'। প্রাচ্যবিদ মিলটন কোয়ান-এর আরবী ইংরেজী অভিধান 'মু'জামুল লুগাতুল 'আরাবিয়্যাতুল মুয়াসিরা'তে 'সাকাফা' ও 'তাহযীব' শব্দ দুটির অর্থ লেখা হয়েছে :

'সাকাফা' (ثقافة) Culture, Refinement. Education, Civilization. (অনুশীলন, পরিশুদ্ধ করণ, শিক্ষা, সভ্যতা) এর সমার্থক। আর তাহযীব (تهذيب) Expurgation, Emendation, Correction, Rectification, Revision, Training, Instruction, Education, Culture, Refinement. (বিশুদ্ধকরণ, ভ্রম সংশোধন, সংশোধন, সংস্কার সাধন, পরীক্ষা করা, প্রশিক্ষণ, উপদেশ দান, শিক্ষা, অনুশীলন ও পরিমার্জিত করণ) এর সমার্থক।[৪]

মূলত সংস্কৃতি অর্থ সংস্কার সাধন, পরিমার্জিত, অনুশীলন, কোন জাতির বিশেষ ধরনের মানসিক বিকাশ, শিক্ষা ও সভ্যতা।

---

[১] অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ সমার্থ শব্দ কোষ*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি, কলকাতা, (২য় সংস্করণ ২০১১), পৃ. ১৩৬।

[২] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ড. শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, (চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৪) ঢাকা, পৃ. ৬৫৪।

[3] Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, (Second Edition 2012), p. 182.

[৪] Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Language Services, Inc, (Third Printing 1976) p. 104, 1024.

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির পরিচয় প্রসঙ্গে Tylor তাঁর প্রিমিটিভ কালচার গ্রন্থে লিখেছেন :

"Culture is that Complex whole which includes knowledge, Belief, Art, Moral law, Custom and other Capabilities and habits aquired by man as a member of the society."[১]

অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিক বিধান, আচার-আচরণ ও অন্যান্য যোগ্যতা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত অভ্যাসের সমষ্টিগতরূপ।

সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে এলিয়ট, ফিলিপ বাগবি, ম্যাথু আর্ণল্ড ও বোয়া যে কথা বলেছেন তার ভাবার্থ হচ্ছে-

"কালচার হলো বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবন ধারা ও জীবন পদ্ধতি।"[২]

এলিয়ট সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন । একটি হলো ভাবগত ঐক্য। আর দ্বিতীয়টি প্রকাশ ক্ষেত্রের সৌন্দর্য। Eliot আরেকটি বিবেচনাযোগ্য কথা বলেছেন। তাহলো -

"মানুষ শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে Culture মনে করে। অথচ এগুলো Culture নয়। বরং এগুলো হলো Culture সম্পর্কে ধারণা লাভ করার মাধ্যম।"[৩]

Philip Bagby তাঁর Culture and History নামক গ্রন্থে বলেছেন -

"সংস্কৃতি বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি এতে পরিব্যাপ্ত রয়েছে কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি ও চরিত্রের সবগুলো দিক।"[৪]

ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁর Culture and Anarchy গ্রন্থে সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে -

"সংস্কৃতি হলো মানুষকে পূর্ণ বানাবার নির্মল প্রচেষ্টা। সংস্কৃতি হলো পূর্ণতা লাভ।"[৫]

বোয়া সংস্কৃতির তিনটি দিক বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো -

"এক. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ; দুই. অনুভূতিশীল মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজে সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং; তিন. মানসিক হাবভাব, ধর্ম, নীতি ও সৌন্দর্যজ্ঞান।"[৬]

(খ) ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃতি মানুষের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে, প্রকাশ করে তার অভ্যন্তরীণ ভাবগত অবস্থা। ইসলাম মানুষের মধ্যে যে মানসিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারা সৃষ্টি করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি যে আচরণ করে তাই হলো ইসলামী সংস্কৃতি।[৭]

জনাব ফায়জী ইসলামী সংস্কতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইসলামী সংস্কৃতি হলো -

---

[১] আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫।

[2] T. S. Eliot : *Notes Towards The Defination of Culture*. Publisher : Faber And Faber, London, 1962, P. 13.

[3] T. S. Eliot : *Notes Towards The Defination of Culture*. Ibid, p. 120.

[৪] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২৫৫।

[৫] *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

[৬] *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত,, পৃ. ১৫।

[৭] *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

"১. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রে কোন একযুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল;

২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইসলামী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য; এবং

৩. ইসলামী সমাজে মুসলমানদের জীবন ধারা, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, ভাষা ব্যবহার এবং সামাজিক রীতিনীতি।"[১]

এম, জেড, সিদ্দীকীর মতে -

"ইসলামী সংস্কৃতি বলতে দুটি জিনিসকে ধরা হয়। একটি হলো তার চিরন্তন দিক। আর অপরটি হলো সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সংস্থা। কিন্তু আমরা কেবল প্রথমটিকেই সংস্কৃতি মনে করি। কারণ সংস্কৃতি এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে উঠে। যেমন : আল্লাহ্‌র একত্ব, মানুষের উচ্চ মর্যাদা এবং মানব সমাজের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।[২]

মাওলানা মওদূদী তাঁর 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' গ্রন্থে বলেন -

"ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হলো, মানুষকে সাফল্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে প্রস্তুত করা। ... এ সংস্কৃতি একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের চিন্তা, কল্পনা, স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যরহার, পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম, রাজনৈতি কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর উপরই পরিব্যাপ্ত।"

"ইসলামী সংস্কৃতি কোন জাতীয় বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। প্রকৃত অর্থে এ হলো 'মানবীয় সংস্কৃতি।' .. এ সংস্কৃতি এক বিশ্বজনীন উদার জাতীয়তা গঠন করে। এর মধ্যে বর্ণ, গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে সব মানুষই প্রবেশ করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন হবার মতো ব্যাপকতা।"

তিনি আরো বলেন - "সীমাহীনতা এবং বিশ্বজনীনতার সাথে সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা আর শক্তিশালী বন্ধন। এ সংস্কৃতি তার অনুসারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে বিধানের অনুগত করে তোলে।"

"এ সংস্কৃতি পৃথিবীতে একটি নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কবতে চায়। গড়ে তুলতে চায় একটি সৎ ও পবিত্র জনসমাজ । .. সে চায় সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, অনুশীলন সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, নম্রতা, উচ্চাভিলাস, সৎ সাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, আনুগত্য, আইনানুবর্তিতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণরাজি সৃষ্টি করতে।"[৩]

মূলত মানব জীবনের প্রতিটি দিক কুর'আন-সুন্নাহ্ মোতাবেক পরিচালিত করলে সমাজে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় তাকেই বলা হয় ইসলামী সংস্কৃতি।

খ্যাতনামা বৃটিশ প্রাচ্যবিদ মর্মাডিউক পিকথল (যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন) ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন -

---

[১] *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

[২] *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ২২।

[৩] *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

"Culture means cultivation and, as the word is generally used now-a-days when used alone, especially the cultivation of the human mind. Islamic culture differs from other cultures in that it can never be the aim and object of the cultivated individual, since its aim, clearly stated and set before every one, is not the cultivation of the individual or group of individuals, but of the entire human race...

... The whole of Islam's great work in science, art and literature is included under these two heads- aid and refreshment. Some of it, such as the finest poetry and architecture, falls under both. All of it recognises one leader, follows one guidance, looks towards one goal, The leader is the Prophet [PBUH], the guidance is the Holy Quran and the Goal is Allah.

By Islamic culture, I mean not the culture from whatever source derived, attained at any given moment by people who profess the religion of Islam, but the kind of culture prescribed by a religion of which human progresss is the definite and avowed aim.

No one who has ever studied the Quran will deny that it promises success in this world and hereafter to men who act upon its guidance and obey its laws; that it aims at nothing less than the success of mankind as a whole; and that this success is to be attained by cultivation of man's gifts and faculties....

অর্থাৎ "সংস্কৃতি মানে অনুশীলন এবং এ শব্দটি বর্তমানে সাধারনভাবে শুধুমাত্র মানুষের মনের অনুশীলনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। ইসলামী সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন, তাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনো শুধুমাত্র একক ব্যক্তির অনুশীলন কেন্দ্রিক হতে পারে না। যেহেতু এর লক্ষ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং সকলের সামনে প্রতিষ্ঠিত, তাই এটি শুধুমাত্র ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির অনুশীলন নয় বরং সমগ্র মানব জাতির অনুশীলন। কোন অঞ্চলের শিল্পকলা বা সাহিত্য কর্মে ভ্রান্তি ও অন্যায় বিদ্যমান থাকলে তা ইসলামের মানদণ্ডে বিবেচিত হতে পারে না, তার পরিমাণ যতটুকুই হোক। কোন যুদ্ধ অথবা শান্তির বিজয় তা যতই গৌরবময় হোক না কেন তা ইসলামের ফসল হিসেবে উদ্ধৃত হতে পারে না। ইসলামের উদ্দেশ্য র‍্যাপকতর এবং দৃষ্টিভঙ্গি মহানতর। এর লক্ষ্য চিরন্তন মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া কিছুই নয়। ইসলাম এখনও ধর্ম হিসেবে অন্যান্য যে কোন ধর্মের তুলনায় নিজ এবং জাতির উন্নয়নে মানুষের সকল প্রচেষ্টাকে অধিক অনুপ্রেরণা যোগায়। যেহেতু ইসলাম পৃথিবীতে একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তাই এটা সৃষ্টি করেছে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা, যা অন্যান্য সকল ধর্ম, জাতি ও দর্শনের মাধ্যমে অর্জিত সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে তুলনার দাবি রাখে। একজন মুসলিম শুধুমাত্র অবাক হতে পারে যে, শিল্পকলা ও সাহিত্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে তাকে প্রতিমায় রূপান্তরিত করা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন এগুলোই মানব জীবনের একমাত্র মানদণ্ড এবং তাদের উৎপাদনই চূড়ান্ত লক্ষ্য। এমন নয় যে, মুসলিমগণ সাহিত্য, শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক অর্জনকে অবজ্ঞা করে এবং করা উচিতও নয়। বরং তার জীবনের চলার পথে যাত্রী হিসেবে এগুলো ক্ষণিকের সাহায্য ও নব শক্তি প্রাপ্তি হিসেবে গ্রহণ করে। মুসলিমগণ কখনো এগুলোকে প্রতিমায় পরিণত করে না।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামের সব মহান অবদান এই দুইয়ের মধ্যেই পড়ে। আর এ সকল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একজন নেতার পরিচয় বহন করে। অনুসরন করা হয় একটি দিক নির্দেশনা, একটি নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। নেতা হচ্ছেন মুহাম্মাদ (সাঃ), দিক-নির্দেশক হচ্ছে পবিত্র কুর'আন আর গন্তব্য হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারা আমি সেই সংস্কৃতিকে বুঝাচ্ছি না যার উৎপত্তি যে কোন উৎস থেকে, যা ইসলাম প্রচারকারীদের থেকে অর্জিত হয়েছে। বরং আমি সেই সংস্কৃতিকে বুঝাচ্ছি যা ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এবং যাতে মানব কল্যাণ নিশ্চিত এবং স্বীকৃত।

যে কুর'আন অধ্যয়ন করেছে, কখনো অস্বীকার করতে পারবে না যে, এটি মানুষের ইহকাল ও পরকালের সফলতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যারা এর পথ নির্দেশনা ও বিধান মেনে চলবে। কুর'আনের উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতির সফলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তাই সফলতা অর্জিত হবে মানুষের সক্ষমতা ও মননশীলতার অনুশীলনের মাধ্যমে।

মুসলিম সমাজে যে কোন উন্নতি যদি কুর'আন ও নবীর সুন্নাহ্‌র অনুমোদিত না হয় তাহলে তা অনৈসলামিক এবং এর উৎস অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে কোথাও থেকে গৃহীত। মুসলিমগণ এগুলো গ্রহণের মাধ্যমে কখনো সফলতা আশা করতে পারে না। যদিও তা সফলতার ক্ষেত্রে আপতত দৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক নয়। যে কোন উন্নতি যা কুর'আন ও নবীর আর্দশের পরিপন্থি হয় তখন সেটা অনৈসলামিক। সেটা অবশ্যই মানব জাতির সফলতার বিরোধী এবং মুসলিমগণ সেটা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।"

মাওলানা আবদুর রহীম বলেন -

"ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায় উন্নততর মতাদর্শ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমান। আর এর মৌল ভাবধারা হচ্ছে সেসব মূলনীতি, যেগুলোর উপর আমাদের সংস্কৃতিক কাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থিতি নির্ভরশীল।...সংক্ষেপে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : ১. তাওহীদ ২. মানবতার সম্মান ৩. বিশ্বব্যাপকতা, সার্বজনীনতা ৪. ভ্রাতৃত্ব ৫. বিশ্ব শান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ৬. বিশ্ব মানবের ঐক্য ৭. কর্তব্য ও দায়িত্বের অনুভূতি ৮. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ৯. পংকিলতা মুক্ত হওয়া ১০. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ১১. ভারসাম্যতা, সুষমতা ও সাম্য। এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাই ইসলামী সংস্কৃতি।"[১]

সুতরাং সংক্ষেপে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো -

১. আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস ও এক আল্লাহ্‌মুখীতা;

২. আল্লাহ্‌ প্রেম, আল্লাহ্‌ ভীতি, আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের প্রেরণা;

৩. আখিরাত বা পরকালের চিন্তা;

৪. আত্মশুদ্ধি, আত্মার প্রশান্তি;

৫. নৈতিক মূল্যবোধ;

৬. চিন্তা, চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা;

৭. অনাবিলতা ও পরিচ্ছন্নতাবোধ;

---

[১] *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

৮. সৌন্দর্যবোধ;
৯. দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্যবোধ;
১০. উদারতা;
১১. আত্মসম্মান, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ;
১২. মানবতাবোধ;
১৩. মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান;
১৪. মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ;
১৫. মানবতার ঐক্যবোধ;
১৬. আত্মীয়তাবোধ;
১৭. সামাজিকতাবোধ;
১৮. নির্লোভ ও নিরহংকার মানস;
১৯. দয়া, মায়া, ক্ষমা, কোমলতা ও ভালোবাসা;
২০. নেতৃত্ববোধ;
২১. বিনয়, আনুগত্য ও শৃংখলাবোধ;
২২. আদর্শবোধ, রিসালাতের অনুবর্তন;
২৩. মিশনারী মনোভাব;
২৪. সুবিচার;
২৫. ভারসাম্যতা; এবং
২৬. বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতা ।

কুর'আন-হাদীসে ইসলামী সংস্কৃতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটি হলো প্রধান। চারটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ তুলে ধরা হলো-

(১). আল্লাহ্‌মুখীতা

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান একটি দর্শন। এ দর্শন একত্ববাদের। ব্যক্তির যাবতীয় বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভংগি, চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ঘৃণা-ভালবাসা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া ও আবেগ-উদ্বেগ এক আল্লাহ্‌র সাথে কেন্দ্রীভূত করে দেয়াই এ দর্শনের মূল কথা।

মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুর'আনে মানব জীবনের সকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই সাথে রাসূল পাঠিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) নির্দেশনাসমূহ কীভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। কীভাবে জীবনের সকল বিভাগ তাওহিদী দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, তার হুবহু নমুনা ছিলো রাসূল (সাঃ)-এর বাস্তব জীবন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে তিনি এ দর্শনকে রূপায়িত করে গেছেন। আল-কুর'আনের বাস্তব রূপ ছিলো তাঁর জীবন। হযরত আয়িশাহ্‌ (রাঃ) বলেন :"কা-না খুলুকুহুল কুর'আন- অর্থাৎ কুর'আনই ছিলো তাঁর চরিত্র।"

রাসূলুল্লাহ্‌র গোটা জীবন নিবেদিত ছিলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণায়, তাঁর হুকুম পালনের চেতনায়, তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের অনুভূতি আর তাঁর অনিচ্ছা ও অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার তাড়নায়।

আল্লাহ্‌র ভয় ও ভালবাসা তাঁকে উদ্বেলিত করতো প্রতিনিয়ত। পরকালীন জবাবদিহিতার

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা তাঁকে আবিষ্ট রাখতো প্রতি মুহূর্ত। জাহান্নামের ভয়ে ভীত আর জান্নাতের আকাংখায় উজ্জীবিত হতেন তিনি প্রতি রাতে। সে কারণেই তাঁর সমগ্র জীবন তৈরি হয়েছিল রব্বুল আলামীনের ইচ্ছানুযায়ী। তাঁর সাথীদের জীবনও ছিলো তাঁরই জীবনানুসৃত।

এভাবে এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস, রিসালাতের রূপরেখা আর পরকালের মুক্তি ও জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে উঠে যে কালচার, তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি।

এই শাশ্বত বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংস্কৃতি সর্বাংগীন, সুন্দর ও নিখুঁত। এর প্রতিটি উপাদান স্বচ্ছ শিশিরের মতো।

এ সংস্কৃতি এমন সংস্কৃতি, যেখানে শুধু মনের আনন্দই নয়, আত্মার প্রশান্তিও আছে। এখানে হৃদয়মনের প্রশস্ততা কেবল ইহ জাগতিক নয় বরং পরকাল পরিব্যাপ্ত। এখানে মন স্বেচ্ছাচারী কিংবা সহস্রগামী নয় বরং মন তার মনিবের অনুগত। এখানে মন একাধিক মনিবের অনুশাসন মানে না, একক স্রষ্টাই কেবল তার মনিব। এখানে স্রষ্টা কেবল স্রষ্টাই নন, তিনি সার্বভৌম হুকুমকর্তা। তিনি শুধু কঠোর শাস্তিদাতাই নন, তিনি বিধানদাতা, দয়াময়, করুণাময় ও ক্ষমাশীল। অনুগতদের সহায়ক তিনি, পুরস্কার দানে প্রতিশ্রুত তিনি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বহুগামী নয়, রব্বুল আলামীনের অনুগামী।

এসব কারণে ইসলামী সংস্কৃতির সৌন্দর্য অনুপম। এর মহিমা অফুরন্ত। এর সুফলের শেষ নেই। সৃষ্টি সেবা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই এর বাহকদের জীবনের লক্ষ্য। আল কুর'আনে তাদের জীবন লক্ষ্যের ছবি আঁকা হয়েছে এভাবে :

قُلْ إنَّ صلاتى ونُسُكي ومَحْيَايَ ومَمَاتي لله رَبِّ العالَمين * لاَ شريكَ لَهُ وَبِذلكَ أُمِرْتُ وأنا أَوَّلُ الْمُسْلمين .

"বলুন, আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যে, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল মুসলিম।"[১]

الَّذين آمَنُوا يُقاتِلُون فى سبيل الله .

"যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, তাঁরা শুধু আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে।"[২]

ومن النَّاس من يَشْرى نفسهُ ابْتغاءَ مَرْضَات الله والله رَءُوفٌ بالْعباد .

"মানুষের মাঝে এমন একদল লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর এই বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।"[৩]

انَّ الَّذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحَات أُوْلئك هُمْ خَيْرُ البَرِيَّة * جزاؤُهُمْ عند رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجْرى من تحْتها الأنْهارُ خالدين فيها أبدًا رَّضي اللهُ عَنْهُمْ ورضُوا عَنْهُ ذلكَ لمَنْ خشيَ رَبَّهُ .

"যারা ঈমানের পথ ধরেছে এবং সততা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করেছে, তাঁরাই সৃষ্টির সেরা। প্রতিপালকের নিকট তাঁদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান।

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল-আন'আম, ১৬২-১৬৩।
[২] আল-কুর'আন : সূরা আন-নিসা, ৭৬।
[৩] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ২০৭।

সেখানে তাঁরা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্‌র তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও তাঁর প্রতি পরম সন্তুষ্ট। এগুলো সেসব লোকদের জন্য, যাঁরা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলে।"[১]

সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেলো, ইসলামী সংস্কৃতি এক আল্লাহ্‌মুখী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বাহকরা কেবল এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করেন; জীবনে কেবল তাঁর হুকুমকেই রূপায়িত করেন; তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে লড়াই করেন, তাঁর আদেশ পালনের জন্যে বেঁচে থাকেন, কেবল তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্যে ইন্তেকাল করেন। তাঁরা কেবল তাঁরই পুরস্কারের পরম আকাংখী। তাঁর ভয় এবং তাঁর ভালবাসাই তাঁদের উজ্জীবিত করে। তাঁদের সব চেতনা জুড়ে এক আল্লাহ্‌র অনুভূতি তীব্রভাবে বিদ্যমান।

(২). পবিত্রতা ও নৈতিকতাবোধ

ইসলামী সংস্কৃতির আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এর পবিত্রতা, অনাবিলতা, প্রশস্ততা ও নির্মলতা। এক আল্লাহ্ মুখী হবার কারণে ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মন ও মননশীলতা সৃষ্টি করে, তার প্রভাবে মানব মন সব ধরনের কলুষতা, পংকিলতা, সংকীর্ণতা, হঠকারিতা, প্রতারণা, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, হিংসা, বিদ্বেষ, হিংস্রতা, অমানবিকতা, জুল্‌ম, অবিচার, অসুন্দর, বেমানান, বেআদবি, পাপাচার ও নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ পূত পবিত্র। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মানসকে পুত-পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। চরিত্র, আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর দেহ ও পোষাক পরিচ্ছেদকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল করে।

আল-কুর'আনে এ সংস্কৃতির বাহকদের প্রভাব সম্পর্কে এসেছে এভাবে :

قدْ أفْلح من تزَكّى .

"সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অবলম্বন করেছে।"[২]

قدْ أفْلحَ مَن زَكَّاهَا * وَقدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا .

"নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর ব্যর্থ হয়েছে সে ব্যক্তি যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে।"[৩]

كَمَا أرْسلْنا فيكمْ رسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عليْكمْ آياتنَا وَيُزكّيكمْ وَيُعَلّمُكمُ الكتَابَ والْحكْمَةَ وَيُعَلّمُكم مَّا لَمْ تكُونُوا تعْلمُون .

"আমি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ পরিপাটি করে দেয়, তোমাদেরকে আমার কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয় এবং তোমাদের এমন বিষয় শেখায়, যা তোমরা জানতেনা।"[৪]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাইয়্যেনা, ৭-৮।
[২] আল-কুর'আন : সূরা আল-আ'লা, ১৪।
[৩] আল-কুর'আন : সূরা আশ-শাম্‌স, ৯-১০।
[৪] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

والَّذين لاَ يدْعُون مَعَ الله إلَهًا آخر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس التى حرَّمَ اللّهُ إلاَّ بالْحقِّ ولاَ يزْنُون ومن يفْعلْ ذلك يلْق أثاما .

"(আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) তাঁরা আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকেও ইলাহ্ মানে না, আল্লাহ্ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। যে-ই তা করবে, সে পাপের শাস্তি ভোগ করবে।"[১]

والَّذين لا يَشْهَدُون الزُّور وإذا مرُّوا باللَّغو مَرُّوا كرامًا * والَّذينَ إذا ذُكِّرُوا بآيات ربِّهِمْ لَمْ يَخرُّوا عَلَيْهَا صُمًا وعُمْيانًا * والَّذين يقُولُون ربَّنا هبْ لنا منْ أزْوَاجنا وذُرِّيَّاتنا قُرَّةَ أعْيُنٍ واجْعلْنا للْمُتَّقين إمَامًا * أُوْلئك يُجْزوْن الغُرْفة بما صبرُوا ويُلَقوْن فيها تحيَّةً وسلامًا * خالدين فيها حسُنتْ مُسْتَقرًا ومُقامًا .

"(আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) তাঁরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, কোন বাজে জিনিসের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়, তাঁদেরকে যদি তাঁদের প্রতিপালকের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয়, তাঁরা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না। তাঁরা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও আর আমাদের মুত্তাকী লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো। এসব লোক নিজেদের ধৈর্য্যের ফল উচ্চ মনযিল আকারে পাবে। অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাঁদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেখানে তাঁরা অনন্তকাল থাকবে। অতিশয় চমৎকার হবে তাঁদের সেই আশ্রয় ও আবাস।"[২]

আল্লাহ্ এ সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তাঁর রাসূলকে উজ্জীবিত করে বলেছেন :

يا أيُّها الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذرْ *وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيابكَ فطهِّرْ * والرُّجْزَ فَاهْجُرْ .

"হে কম্বল আচ্ছাদিত শয়নকারী! উঠো এবং (মানুষকে) সতর্ক করো। তোমার পোশাক পরিচ্ছেদ পবিত্র রাখো আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।[৩]

يا أيُّها الَّذين آمنُوا إنَّمَا الخمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالأنصابُ وَالأَزْلامُ رجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطان فاجْتَنِبُوهُ لعَلَّكُمْ تُفْلحُون .

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার দেবী, ভাগ্য নির্ণায়ক তীর এগুলো শয়তানি কাজ। কাজেই তোমরা এগুলো থেকে দূরে থাকবে। তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[৪]

وذرُوا ظاهر الإِثْم وباطنهُ .

"তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকার পাপ পরিহার করে।"[৫]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা ফুরকান, ৬৮।
[২] আল-কুর'আন : সূরা আল ফুরকান, ৭২-৭৬।
[৩] আল-কুর'আন : সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির, ১-৫।
[৪] আল-কুর'আন : সূরা আল-মায়িদা, ৯০।
[৫] আল-কুর'আন : সূরা আল আন'আম, ১২০।

قُلْ تعَالوْا أتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليْكُمْ ألاَّ تُشْرِكُوا به شَيْئًا وبالْوَالدَيْن إحْسَانًا ولاَ تقْتُلُوا أوْلادكُم مِّنْ إمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقكُمْ وإيَّاهُمْ ولاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحشَ ما ظَهر منْها وما بَطن ولاَ تقْتُلُوا النَّفْس الَّتى حرَّمَ اللّهُ إلاَّ بالْحَقِّ ذلكُمْ وصَّاكُم به لَعلَّكُمْ تَعْقلُون .

"হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে বলুন, এসো আমি তোমাদের বলে দিই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন :

১. তোমরা তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না,

২. পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে,

৩. দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না। তোমাদের জীবিকাও তো আমি দিচ্ছি, তাদেরও দেবো,

৪. অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ গোপন হোক প্রকাশ্য হোক, তার ধারে কাছে যাবে না,

৫ আল্লাহ্ যে জীবনকে মর্যাদা দান করেছেন, ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না।

তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, আশা করা যায়, তোমরা বুদ্ধিবিবেক খাটিয়ে কাজ করবে।"[১]

قُلْ إنَّما حرَّمَ رَبِّي الفَوَاحشَ مَا ظَهر منْها وَمَا بطَن وَالإثْمَ وَالْبَغْي بغَيْر الحَقِّ وأَن تُشْرِكُوا باللّه .

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলুন : আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন : ১. প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা ২. পাপ ৩. সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি এবং ৪. আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করা।"[২]

ولا تقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَان فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হবে না। ওটা জঘণ্য অশ্লীল কাজ এবং চরম নিকৃষ্ট পন্থা।"[৩]

يا أيُّها الَّذينَ آمنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارى حَتَّى تعْلَمُوا مَا تَقُولُون ولاَ جُنُبًا إلاَّ عَابِرى سَبيلٍ حَتَّى تَغْتَسلُوا وإن كُنتُم مَّرْضَى أوْ عَلَى سفرٍ أوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائط أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بوُجُوهكُمْ وَأيْديكُمْ إنَّ اللّهَ كان عفُوًّا غَفُورًا .

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সলাতের কাছে যেয়োনা। সলাত আদায় করবে তখন, যখন কি বলছো তা অনুধাবন করতে পারো। অপবিত্র অবস্থায় ও গোসল করার আগ পর্যন্ত সলাতের কাছে যেয়োনা। তবে ভ্রমণরত থাকলে তা ভিন্ন কথা। আর তোমরা যদি কখনো অসুস্থ থাকো বা ভ্রমণরত থাকো অথবা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসো কিংবা যদি স্ত্রী সহবাস করো আর পবিত্র হবার জন্যে পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। তা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতের উপর বুলাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ কোমল ও ক্ষমাশীল।"[৪]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল-আন'আম, ১৫১।

[২] আল-কুর'আন : সূরা আল-আ'রাফ, ৩৩।

[৩] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইস্রাঈল, ৩২।

[৪] আল-কুর'আন : সূরা আ-নিসা, ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন ধৌত করে নিবে নিজেদের চেহারা, কনুই পর্যন্ত হাত আর মাসেহ করে নিবে নিজেদের মাথা এবং ধৌত করে নিবে নিজেদের পা গিরা পর্যন্ত। কিন্তু যদি তোমরা অপবিত্র থাকো তবে উত্তমরূপে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে– মাটি দিয়ে নিজেদের চেহারা ও হাত মাসেহ করে নিবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কঠিন দায়িত্ব দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পাক-পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নি'আমাত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[১]

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .

"তোমার কাছে তারা নারীদের ঋতুকাল সম্পর্কে বিধান চাচ্ছে। তুমি বলো : সেটা অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। সে সময় তোমরা স্ত্রী সহবাস বর্জন করো এবং তারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ো না। অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশমত সহবাস করো। যারা সীমালংঘন থেকে বিরত থাকে এবং পূত পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।"[২]

ইসলামে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে পবিত্রতা অবলম্বনের নির্দেশনা এসেছে এভাবে :

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون * إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আহার করো পবিত্র বস্তু থেকে যা আমি তোমাদের রিয্ক হিসেবে দিয়েছি এবং আল্লাহ্র শোকর করো যদি তোমরা শুধু তারই 'ইবাদাত করে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং তা যার উপর যবেহর সময় আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার কোন গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল মায়িদা, ৬।

[২] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ২২২।

[৩] আল-কুর'আন : সূরা বাকারা, ১৭২-১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সুন্দর ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন কথা বলার ব্যাপারে এসেছে এভাবে :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ .

"তুমি কি দেখছো না আল্লাহ্ কী সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন : একটি ভালো পবিত্র কথা একটি ভালো পবিত্র গাছের মতোই, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত, আর শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। প্রতিমুহূর্তে যে ফলদান করছে তার প্রতিপালকের নির্দেশে। আল্লাহ্ এ উদাহরণ এ জন্য দিচ্ছেন, যেন লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে একটি মন্দ কথার উপমা হচ্ছে একটি মন্দ গাছ, যাকে সহজেই উপড়ে ফেলা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ্ ঈমানদারদের মজবুত শাশ্বত কথার ভিত্তিতে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠিত করেন। আর পাপীদের করেন পথ ভ্রান্ত। আল্লাহ্ যা চান তাই করেন।[১]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولٰئِكَ هُوَ يَبُورُ .

"যে মান সম্মান চায়, সে জেনে রাখুক সকল মান-মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্র। তাঁর কাছে কেবল পবিত্র কথাই উপরের দিকে আরোহণ করে আর সৎ ও পরিশুদ্ধ কর্মই তাকে উপরে উঠায়। যারা অনর্থক চালবাজি করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর তাদের চালবাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আপনাতেই।[২]

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দিন : পবিত্র আর অপবিত্র কখনো সমান হতে পারে না, অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের যতই চমৎকৃত করুক না কেন। কাজেই তোমরা বুদ্ধিমানেরাই আল্লাহ্র নিষেধকৃত কাজ থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[৩]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

"যে সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক সে মু'মিন, আমি তাকে পৃথিবীতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করাবো আর আখিরাতে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করবো।"[৪]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা ইবরাহীম, ২৪-২৭।
[২] আল-কুর'আন : সূরা ফাতির, ১০।
[৩] আল-কুর'আন : সূরা আল-মায়িদা, ১০০।
[৪] আল-কুর'আন : সূরা আন-নাহল, ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ ইসলামী সংস্কৃতির ধারক বাহকদের পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

وإنَّ لكَ لأجْرًا غيْرَ ممْنُون * وإنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ .

"নিঃসন্দেহে তোমার জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। কারণ, নিশ্চয় তুমি মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।[১]

(৩). মানবতাবোধ

ইসলামী সংস্কৃতির আরেক অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো মানবতাবোধ। মু'মিনের জীবনবোধ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ। মানবতাবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। বরং এটাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণ। মানবতাবোধ হলো, মানুষের জন্য অনুভূতি, মানবিক চেতনা, মানুষের কল্যাণ কামনা, মানুষের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং মানুষের সুখ-শান্তিতে আনন্দিত হওয়া। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে; মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয়; মানব কল্যাণে ব্রত হয়; মানুষের উন্নতি ও সর্বাংগীণ সুখ-শান্তি বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করে। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের প্রতি সুবিচার করে। মানুষ মানুষের অধিকার দিয়ে দেয়, অধিকার সংরক্ষণ করে। মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হলে, মানুষের উপর অত্যাচার-নির্যাতন হলে অপর মানুষদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। এটাই হলো ইসলামী সংস্কৃতির শাশ্বত রূপ।

এ বোধের অভাবেই মানুষ মানুষের অধিকার হরণ করে। মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। মানুষ মানুষকে দুঃখ-কষ্ট দেয়। মানুষের দুঃখ-কষ্টে মানুষ ব্যথিত হয় না। মানুষ মানব কল্যাণে এগিয়ে আসে না, মানব সেবায় ব্রত হয় না। এটা নিষ্ঠুরতা, পাষণ্ডতা, অমানবিকতা ও পাশবিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে এদের অবস্থা হলো :

"তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তাতে বোধ নেই। তাদের চোখ আছে বটে, কিন্তু তাতে অন্তরদৃষ্টি নেই। তাদের কান আছে বটে, কিন্তু তাতে শ্রবণ শক্তি নেই। এদের অবস্থা হচ্ছে পশুর মতো। বরং পশুর চাইতেও বিভ্রান্ত। এরা চেতনা বোধহীন।"[২] মুলত এটাই হলো জড়বাদী সংস্কৃতির বীভৎস রূপ।

ইসলাম মানবতার ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর গোটা ব্যবস্থাই মানুষের কল্যাণের জন্যে। নবীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে দ্বীন ইসলাম পাঠাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন :

لقدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبيِّنات وأنزلْنا مَعَهُمُ الكتاب والْميزانَ ليقُومَ النَّاسُ بالْقسْط .

"নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছিলাম আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাঁদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ তার ন্যায্য অধিকার লাভ করে ও মানব সমাজ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল-কলম, ৩-৪।
[২] আল-কুর'আন : সূরা আল-আ'রাফ, ১৭৯।
[৩] আল-কুর'আন : সূরা আল-হাদীদ, ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

"তোমরা সর্বোত্তম দল, তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানবতার কল্যাণার্থে। তোমরা কল্যাণকর কাজের আদেশ করবে আর অকল্যাণকর কাজ থেকে নিষেধ করবে।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : الدِّينُ النَّصِيحَةُ "দ্বীন ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ কামনা।"[২]

ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মাঝে নিঃস্বার্থ মানবতাবোধ সৃষ্টিতেই সদা সক্রিয়। এর সাথে কোন বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত থাকে না। এর বহু প্রমাণ রয়েছে। তার কয়েকটি হলো :

মহান আল্লাহ্ কুর'আনুল কারীমে বলেন :

১. তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না।[৩]

২. পিতা-মাতার প্রতি সদয় হও।[৪]

৩. নিকটাত্মীদের অধিকার প্রদান করো।[৫]

৪. দরিদ্রদের অধিকার দিয়ে দাও।[৬]

৫. ধনীদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।[৭]

৬. বিপদগ্রস্ত পথিকদের প্রতি দয়াশীল হও।[৮]

৭. মানুষের প্রতি দয়া করো, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করেছেন।[৯]

৮. দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না।[১০]

৯. অন্যায় ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করবে না।[১১]

১০. ইয়াতীমের সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে তার কাছেও যাবে না।[১২]

১১. ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ করে দিবে, কম দিবে না।[১৩]

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া হালাল রিযিক থেকে খাও, অপবিত্র জিনিস খাবে না।[১৪]

১৩. তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে করো কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আলে ইমরান, ১১০।
[২] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, *মুসনাদ-এ আহমাদ*, হা/ ৩২৮১, মুয়াসসাসাতু রিসালা প্রকাশিত, ২০০১।
[৩] আল-কুর'আন : বনি ইসরাঈল, ২৩।
[৪] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইসরাঈল, ২৩।
[৫] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইসরাঈল, ২৬।
[৬] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইসরাঈল, ২৬।
[৭] আল-কুর'আন : সূরা হিজর, ১৯।
[৮] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইসরাঈল, ২৬।
[৯] আল-কুর'আন : সূরা কাসাস, ৫৫।
[১০] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইসরাঈল, ৩১।
[১১] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইসরাঈল, ৩৩।
[১২] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইসরাঈল, ৩৪।
[১৩] আল-কুর'আন : বনি ইসরাঈল, ৩৫।
[১৪] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ও নবীগণের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিষ্কৃতি দিতে দান করবে এবং সলাত কায়িম করবে ও যাকাত দিবে, ওয়াদা করার পর স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী ।[১]

১৪. তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ হরণ করো না ।[২]

১৫. গর্ভধারিনীরা পূর্ণ দু'বছর তাদের সন্তানদের দুধ পান করাবে ।[৩]

১৬. হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যেসব জীবিকা দান করেছি, তা থেকে দান করো, ঐ দিনটি আসার পূর্বেই যেদিন কোন বেচাকেনা থাকবেনা, বন্ধুত্ব কাজে আসবেনা এবং সুপারিশ করতে কেউ এগিয়ে আসবে না ।[৪]

১৭. যারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে তাঁদের এ দানের উপমা হলো বীজের ন্যায় । যেন একটি বীজ বপন করা হলো । তা থেকে বেরুলো সাতটি শীষ আর প্রতিটি শীষে জন্ম নিলো শত বীজ । আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন । তিনি সীমাহীন উদার মহাজ্ঞানী ।[৫]

১৮. দান করে কষ্ট দেয়ার চাইতে, দান না করে সুন্দর কথা ও ক্ষমা অনেক উত্তম ।[৬]

১৯. তোমরা জনকল্যাণে যে ব্যয় করো, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে ।[৭]

২০. আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম ।[৮] কারণ সুদের ক্ষতিকর দিকসমূহ মানবতাবোধকে ধ্বংস করে দেয় এবং এর মাঝে কোন কল্যাণ নিহিত নেই ।

২১. আর সে (ঋণ গ্রহীতা) যদি কষ্টের মধ্যে থাকে তবে তাকে অবকাশ দাও । আর যদি দান করে দাও, তবে তাতে রয়েছে সর্বাধিক কল্যাণ ।[৯]

২২. যার কাছে আমানত রাখা হয়, সে যেন আমানত ফেরত দেয় এবং যেন তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে ।[১০]

২৩. তোমরা উৎকৃষ্ট সম্পদের সাথে নিকৃষ্ট সম্পদ বদল করবে না ।[১১]

২৪. তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদের মোহর দিয়ে দাও ।[১২]

২৫. পিতা ও আত্মীয়স্বজন যে অর্থ সম্পদ রেখে মারা যায়, তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও ।[১৩]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ১৭৭ ।
[২] আল-কুর'আন : সূরা আলবাকারা, ১৮৮ ।
[৩] আল-কুর'আন : সূরা আলবাকারা, ২৩৩ ।
[৪] আল-কুর'আন : সূরা আলবাকারা, ২৫৪ ।
[৫] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ২৬১ ।
[৬] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ১৬৩ ।
[৭] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ২৭৩ ।
[৮] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ২৭৫ ।
[৯] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ৮০ ।
[১০] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ২৮০ ।
[১১] আল-কুর'আন : সূরা আন-নিসা, ২ ।
[১২] আল-কুর'আন : সূরা আন-নিসা, ৪ ।
[১৩] আল-কুর'আন : সূরা আন-নিসা, ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. তোমরা মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালাকালে সুবিচার করো।[১]

২৭. বিশ্বাস ঘাতকদের পক্ষে ওকালতি করবে না।[২]

২৮. হে ঈমানদারগণ! সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।[৩]

২৯. তোমরা কল্যাণকর ও বিবেকসম্মত কাজে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে সহাযোগিতা করো না।[৪]

৩০. স্ত্রীদের সাথে তোমরা উত্তম আচরণ করবে।[৫]

৩১. হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক তীর নিক্ষেপ নোংরা-শয়তানি কাজ, সুতরাং এসব কাজ থেকে বিরত থাকো।[৬]

৩২. আল্লাহ্ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না।[৭]

৩৩. আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৮]

৩৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা কর্তৃত্ব লাভ করলে তাদের চেষ্টা নিয়োগ করে বিপর্যয় সৃষ্টির কাজে এবং শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংসের কাজে। আল্লাহ্ এসব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।[৯]

৩৫. ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে মানুষকে ধিক্কার দিয়ে বেড়ায়।[১০]

৩৬. ধ্বংস এমন ব্যক্তির জন্যে, যে অর্থ সম্পদ পুঞ্জিভূত করে এবং গুণে গুণে রেখে দেয়।[১১]

৩৭. সেই দুর্গম পথটি হলো মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, অনাহারের দিনে কোন নিকটের ইয়াতীমকে কিংবা ধুলো মলিন দরিদ্রকে খাবার খাওয়ানো আর সেসব লোকদের সাথী হওয়া যারা ঈমানের পথে এসেছে, পরস্পরকে ধৈর্য্য ধরার ও সৃষ্টির প্রতি দয়া করার উপদেশ দিচ্ছে। এরাই হবে ডান পাশের লোক।[১২]

৩৮. ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না এবং সাহায্য প্রার্থীকে ধমক দিবে না।[১৩]

৩৯. যদি সৌজন্য দেখাও, যদি এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল অতি দয়ালু।[১৪]

৪০. আমার বান্দাদের বলে দাও! তারা যেন এমন কথা বলে, যা সুন্দর, চমৎকার ও কল্যাণময়।[১৫]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আন-নিসা, ৫৮।
[২] আল-কুর'আন : সূরা আন-নিসা, ১০৫।
[৩] আল-কুর'আন : সূরা আন-নিসা, ১৩৫।
[৪] আল-কুর'আন : সূরা আল-মায়িদা, ২।
[৫] আল-কুর'আন : সূরা আন-নিসা, ১৯।
[৬] আল-কুর'আন : সূরা আল-মায়িদা, ৯০।
[৭] আল-কুর'আন : সূরা আলে ইমরান, ১৪০।
[৮] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ১৯০।
[৯] আল-কুর'আন : সূরা আল-বাকারা, ২০৫।
[১০] আল-কুর'আন : সূরা আলে ইমরান, ১৩৪।
[১১] আল-কুর'আন : সূরা আল-হুমাযা, ২।
[১২] আল-কুর'আন : সূরা আত-তাওবা, ১৩-১৮।
[১৩] আল-কুর'আন : সূরা আদ্দুহা, ৯-১০।
[১৪] আল-কুর'আন : সূরা তাগাবুন, ১৪।
[১৫] আল-কুর'আন : সূরা বনি ইসরাঈল, ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং ন্যায়সংগত কথা বলো ।[১]

এটাই হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ সংস্কৃতির সরণি । মানবতাবোধ শিখতে ও জানতে হলে, সত্যিকার মানবদরদী এবং মানবতাবোধে উদ্ধুদ্ধ হতে হলে এ কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ।

অনুরূপভাবে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস ভান্ডারের দিকে । বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রকৃত মানবতাবোধের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এরশাদ করেছেন :

" يا ابْن آدم إنَّكَ أنْ تَبْذُل الْفضْل خَيْرٌ لكَ وأنْ تُمْسكهُ شرٌّ لك ولاَ تُلامُ على كفَاف وابْدأْ بمَنْ تعُولُ " .

১ । হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ খরচ করো, তাহলে এটা তোমার জন্য কল্যাণকর । আর যদি তা ধরে রাখো, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য অনিষ্টকর । তোমার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ যথেষ্ট, তা ধরে রাখাতে তোমার জন্য তিরস্কার নেই । আর (দান) শুরু করবে তোমার নিকট আত্মীয়দের থেকে ।[২]

" ما نقصَتْ صَدقةٌ منْ مَال " .

২ । দানে সম্পদ কমে যায় না ।[৩]

" الرَّاحمُون يرْحَمُهُمُ الرَّحْمنُ ارْحَمُوا منْ في الأَرْض يرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّماء الرَّحمُ شُجْنةٌ منَ الرَّحْمَن فمَنْ وصلها وصَلَهُ اللهُ ومَنْ قطعَها قطعهُ اللهُ " .

৩ । দয়ালুদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করেন । যারা যমীনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন । দয়া রহমান থেকে উদগত । যে ব্যক্তি দয়ার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে আল্লাহ্ তার সাথে নিজ বন্ধন অক্ষুন্ন রাখেন । আর যে ব্যক্তি দয়ার বন্ধন ছিন্ন করে, আল্লাহ্ তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন ।[৪]

" مَا نقصتْ صدقةٌ منْ مَال ومَا زادَ اللهُ عَبْدًا بعَفْو إلَّا عزًّا ومَا تواضَعَ أحَدٌ للّه إلَّا رَفَعَهُ اللهُ ".

৪ । দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না, ক্ষমা করার দ্বারা আল্লাহ্ কেবল ইজ্জত বৃদ্ধি করেন, আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন ।[৫]

" لا يرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يرْحَمُ النَّاسَ ومنْ لا يَغْفرْ لا يُغْفرْ لهُ " .

৫ । যে মানুষকে দয়া করে না সে আল্লাহ্‌র দয়া পায় না । আর যে মানুষকে ক্ষমা করে না সে (আল্লাহ্‌র) ক্ষমা পায় না ।[৬]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল-আহযাব, ৭০ ।

[২] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী সম্পাদিত, বৈরুত ছাপা, হা/১৭১৮ ।

[৩] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা/৬৭৫৭; *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/৭২০৬, ৯০০৮ ।

[৪] *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/৬৪৯৪; ইমাম মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ আত-তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, মাকতাবা শামেলা, (শায়খ আলবানীর তাহক্বীক্বসহ), হা/১৯২৪; ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস, *সুনান আবূ দাউদ*, দারুল হাদীস আল-কাহিরাহ (মিসর), ১৯৯৯, হা/৪৯৪১ ।

[৫] *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হা/২০২৯ ।

[৬] *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/১৯১৬৯, ১৯২৪৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

" مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

৬। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের মান-ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন।[১]

" أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ " . وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى " .

৭। আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এই দুই আংগুলের মতো একত্রে থাকবো। এই বলে নবী (সাঃ) তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল দিয়ে ইশারা করে দেখান।[২]

"إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا " .

৮। তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম লোক তারাই, যাদের চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।[৩]

"انَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ "

৯। আল্লাহ্ নিজে কোমল ও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালবাসেন। তিনি কোমলতা দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন, যা কঠোরতা দ্বারা দান করেন না। তথা কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না।[৪]

" وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ " .

১০। সুন্দর কথাও একটি দান।[৫]

" لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ".

১১। ভাল কাজের ছোট অংশকেও অবজ্ঞা করো না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ এর মতো বিষয় হয়।[৬]

" أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ " .

১২। এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলো, ইসলামের কোন কাজটি সব চাইতে উত্তম? নবী (সাঃ) বললেন : ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং চেনা-অচেনা নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা।[৭]

عن ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " .

---

[১] *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/২৭৫৪৩।

[২] *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/২২২৮৪; শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্*, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৯৯৫, হা/৮০০।

[৩] ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (ফাতহুল বারীসহ), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ২০০০, হা/৩৫৫৯।

[৪] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা/৬৭৬৬।

[৫] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হা/২৯৮৯; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা/২৩৮২।

[৬] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা/৬৮৫৭।

[৭] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হা/১২, ২৮; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা/১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেন : পিতা-মাতার আনুগত্য করা।[১]

" ما منْ مُسْلم يَعُودُ مُسْلما غُدْوةً إلّا صَلّى عَلَيْه سَبْعُون ألْف ملَك حَتّى يُمْسيَ وإنْ عادَهُ عشيَّةً إلّا صلّى عليْه سَبْعُون ألْف مَلك حَتّى يُصْبحَ وَكانَ لَهُ خَريفٌ في الْجَنّة ".

১৪। যে মুসলিম অপর কোন মুসলিমকে সকাল বেলায় দেখতে যায়, তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। যদি সে তাকে সন্ধ্যা বেলায় দেখতে যায়, তাহলে তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ না সকাল হয় এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরি করা হয়।[২]

" منْ نفّس عنْ مُؤْمنٍ كُرْبةً منْ كُرَبِ الدُّنْيا نفّس اللهُ عَنْهُ كُرْبةً منْ كُرَبِ يَوْمِ الْقيامة وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسرٍ يسّر اللهُ عَلَيْه في الدُّنْيا والْآخرة ".

১৫। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, মহান আল্লাহ্ তার ক্বিয়ামাতের দিনের বিপদাপদের মধ্য থেকে একটি বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন অভাবী লোকের অভাব দূর করে দিবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় অভাব দূর করে দিবেন।[৩]

" منْ أنْظَرَ مُعْسرًا أوْ وضَع لَهُ أظلّهُ اللهُ يَوْمَ الْقيامَة تحْتَ ظلّ عَرْشه يوْمَ لا ظلّ إلّا ظلُّهُ ".

১৬। যে ব্যক্তি কোন অভাবী (ধার গ্রহীতা)-কে সময় দিবে অথবা অব্যাহতি দিবে, আল্লাহ্ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় ছায়া দান করবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।[৪]

" منْ غشّنا فَلَيْسَ منّا ".

১৭। যে প্রতারণা করলো সে আমার লোক নয়।[৫]

সুতরাং আল-কুর'আন ও হাদীসের উপরোক্ত বাণীগুলো থেকে পরিস্কার হলো যে :

ক. মানবতাবোধ ঈমানের সাথে জড়িত।

খ. মানব কল্যাণ ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

গ. মানবতাবোধ শ্রেষ্ঠ ঈমানী গুণ।

ঘ. এ গুণ ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয়না।

ঙ. এ গুণের অধিকারী আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র।

---

[১] *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/৩৮৯০; *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্*, প্রাগুক্ত, হা/১৪৮৯।

[২] *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, হা/৩০৯৮; *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/৯৭৫।

[৩] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা/৭০২৮; আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনান ইবনু মাজাহ*, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৯৯৭, হা/২৪১৭; *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/৪৯৬৯।

[৪] *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হা/১৩০৬; *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/৮৭১১।

[৫] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা/২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

চ. এ গুণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট ঘৃণিত।

ছ. এ গুণের অধিকারী মু'মিনের জন্যে রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।

জ. মানবতাবোধ ও মানবকল্যাণ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ।

ঝ. মানবতাবোধ মানে মানুষের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতিশীল হওয়া।

ঞ. মানবতাবোধ মানে মানুষের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা।

ট. ইসলাম মানবতার ধর্ম।

ঠ. ইসলামী সংস্কৃতি মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ, মানব কল্যাণমূখী সংস্কৃতি।

(৪). সৌন্দর্যবোধ

ইসলাম এক অনুপম আদর্শ ও সংস্কৃতি। তাওহিদী ঈমান এর উজ্জীবনী শক্তি। আত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতা এর প্রাণ। মানবতাবোধ এর প্রতিদিষ্ট প্রত্যাদেশ।

আল্লাহ্ মানুষের জীবন-যাপনের জন্যে যে বিধান দিয়েছেন, তার চাইতে সুন্দর আর কোন বিধান হতে পারে না। আল্লাহ্ সুন্দর। তাঁর প্রদত্ত বিধানও সুন্দর। এই সুন্দরতম বিধান মু'মিনরা নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তোলে। তাই তাঁরা মানুষের মাঝে সুন্দরতম মানুষ। তাঁদের জীবন সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, মহত, আদর্শ ও উন্নত। তাঁদের জীবনের সৌন্দর্য মানব সমাজকে সৌন্দর্য দান করে।

মু'মিনের বাস্তব জীবন হয়ে থাকে ইসলামের বাস্তব স্বরূপ। ইসলামের সব সুন্দর গুণাবলী ফুলের মতো ফুটে উঠে তার চরিত্রে, তার কর্মে। তার আদর্শ-কালচার ও জীবন ধারা থেকে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্যকে জেনে বুঝে নেয়।

সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী আদর্শেরই সাক্ষ্যবহ। ফলে ইসলামের সব কাজের পেছনেই সক্রিয় থাকে এক পূত অনাবিল সৌন্দর্যবোধ। এই সৌন্দর্যবোধ মু'মিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

(ক) মনের সৌন্দর্য : মানুষ যখন কোন কাজ করে, তখন প্রথমে মন মস্তিষ্ক সে বিষয়ে চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। অতপর অংগ প্রত্যংগ তা বাস্তবায়ন করে। মন যদি সুন্দর চিন্তা করে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর কাজ করে। মন যদি কুচিন্তা করে, অন্যায় সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অংগ-প্রত্যংগ তা-ই বাস্তবায়ন করে। মনের কাজই চিন্তা করা। সে চিন্তা মুক্ত থাকে না। তাকে সুচিন্তার খোরাক না দিলে সে কুচিন্তা করবেই। মু'মিন সর্বদা তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সুচিন্তার উপকরণ সরবরাহ করতে থাকে। মু'মিনের মনের সৌন্দর্য হলো, মু'মিন সর্বদা :

১. আল্লাহ্র প্রেমে মনকে পাগল করে রাখে;

২. আল্লাহ্র স্মরণে মনকে ব্যস্ত রাখে;

৩. আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবে;

৪. পরকালের জবাবদিহির চিন্তা তাঁর মনকে ব্যাকুল করে রাখে;

৫. ইবাদত ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনের চিন্তা মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে;

৬. সব মানুষের উন্নতি ও কল্যাণের চিন্তা করে। কারো অকল্যাণের চিন্তা করে না। মানুষকে ভালবাসে;

৭. ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা থেকে সে মনকে মুক্ত রাখে;

Dhaka University Institutional Repository

৮. কুচিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখে;

৯. সন্দেহ, সংশয় ও কুধারণা থেকে মনকে মুক্ত রাখে;

১০. বৈষয়িক লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা থেকে মনকে রাখে মুক্ত;

১১. আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয় তাঁর মনকে আচ্ছন্ন রাখে; এবং

১২. তাঁর মনের মধ্যে থাকে জ্ঞানার্জনের পিপাসা।

(খ) কথার সৌন্দর্য : ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলে। তাঁর কথাবার্তার সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করে। তাঁর কথার সৌন্দর্য হলো, সে

১. সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে কথাবার্তা শুরু করে;

২. হাসিমুখে কথা বলে;

৩. সুন্দর ও কোমলভাবে কথা বলে;

৪. সম্মান প্রদর্শন করে কথাবার্তা বলে;

৫. সোজাসুজি কথা বলে, বাঁকা কথা বলে না;

৬. পূর্ণ মনোযোগ সহকারে অন্যের কথা শুনে;

৭. অপরের কথা শেষ হবার আগে কথা বলে না;

৮. যিনি বলতে চান তাকে তার সম্পূর্ণ কথা বলতে দেয়;

৯. কথাবার্তায় শ্রোতার মনে কষ্ট দেয় না;

১০. গীবত করে না;

১১. কথাবার্তায় বিতর্ক পরিহার করে;

১২. বেশি শুনে, কম বলে;

১৩. অর্থবহ কথা বলে, বাজে ও নিরর্থক কথা বলে না;

১৪. কথাবার্তায় মানুষকে হতাশ ও নিরাশ করে না;

১৫. বিবেচনামূলক কথা বলে, অন্যায় বলে না, মিথ্যা বানোয়াট কথা বলে না;

১৬. তার কথা হয়ে থাকে উপদেশ ও পরামর্শমূলক; এবং

১৭. শ্রোতার জন্যে সে দু'আ করে, তার কল্যাণ কামনা করে।

(গ) দৈহিক ও পরিবেশগত সৌন্দর্য : দৈহিক ও পরিবেশগত সৌন্দর্য হয়ে থাকে মু'মিনের নিত্যসঙ্গী। একজন মু'মিন-

১. পায়খানায় গেলে ভালভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়, ঢিলা বা টয়লেট পেপার এবং পানি ব্যবহার করে, হাত ধুইয়ে পরিষ্কার করে নেয়;

২. প্রশ্রাবের পর ঢিলা বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করে, প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে উত্তমভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়;

৩. গোসল আবশ্যক হলে দেরি না করে উত্তমরূপে গোসল করে নেয়, শুক্রবারে গোসল করে;

৪. পরিধেয় পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে;

৫. নখ বড় হতে দেয় না, বড় হলে নখ কেটে নেয়;

৬. চুল ছোট ও পরিপাটি রাখে;

৭. নাক, কান পরিষ্কার রাখে;

Dhaka University Institutional Repository

৮. হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে না;

৯. শরীর সুস্থ রাখে, প্রয়োজনীয় ব্যয়াম করে, অসুখ হলে চিকিৎসা করে;

১০. সে ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে; এবং

১১. সে তার পরিবেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলে, সুসজ্জিত করে তোলে।

মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ .

'আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন :

" الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ" .

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"[২]

(ঘ) পানাহারের সৌন্দর্য : মু'মিনের অনন্য সৌন্দর্য হলো তাঁর পানাহারের সৌন্দর্য। মু'মিন ব্যক্তি-

১. সব সময় হালাল খাদ্য গ্রহণ করে, হারাম পরিত্যাগ করে;

২. আল্লাহ্র নাম নিয়ে খাবার শুরু করে;

৩. পানাহার শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে;

৪. বসে পানাহার করে, দাঁড়িয়ে বা হেলান দিয়ে পানাহার করে না;

৫. পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে;

৬. ডান হাতে আহার করে;

৭. একই পাত্রে বা অন্যদের সাথে খেতে বসলে নিজের কাছের থেকে খায়, নিজে যা পছন্দ করে, অন্যের জন্যেও তা-ই পছন্দ করে;

৮. সে মেহমানদারি করে, মেহমানের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে;

৯. মেহমান এলে প্রয়োজনে একজনের খাদ্য দু'জনে খায় কিংবা মেহমানকে অগ্রাধিকার দেয়;

১০. খাবার অপচয় ও অপব্যয় করে না;

১১. হাত ধুইয়ে পরিষ্কার করে খাবার শুরু করে, খাবার শেষ হলেও হাত ধুইয়ে পরিষ্কার করে নেয়;

১২. ধীরে-সুস্থে খায়;

১৩. মুখে খাবার রেখে কথা বলে না;

১৪. অনেকে একত্রে খেতে বসলে একসাথে খাবার শুরু করে;

১৫. হাড়, কাঁটা ইত্যাদি যা কিছু ফেলতে হয়, যেখানে সেখানে ফেলে না। খাবার গ্রহণের জায়গা অপরিচ্ছন্ন করে না;

১৬. পঁচা অপরিচ্ছন্ন খাবার খায় না; এবং

১৭. সুষম খাদ্য গ্রহণ করে।

---

[১] আল-কুর'আন : সূরাহ আত-তাওবা, ১০৮।

[২] *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/২২৯০২।

(ঙ) **সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য :** মু'মিনের সৌন্দর্যবোধ তাঁর ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের সর্বাংগে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম একজন মু'মিনের উপর অনেক সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে। মু'মিনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সৌন্দর্যের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে। মু'মিনদের কতিপয় মৌলিক সামাজিক সৌন্দর্য হলো :

১. বিশ্বস্ততা;
২. সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতা;
৩. মানুষের কল্যাণ কামনা;
৪. মানব সেবা ও পরোপকার;
৫. দয়া ও ক্ষমা;
৬. আত্মত্যাগ;
৭. সম্মান প্রদান ও স্নেহ পরায়ণতা;
৮. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা;
৯. সাহায্য, সহযোগিতা, উদারতা, অমায়িকতা ও দানশীলতা;
১০. পরামর্শ দান ও গ্রহণ;
১১. পরস্পরের সুখে-দুঃখে শরীক হওয়া;
১২. রোগগ্রস্তকে দেখা-শুনা করা, সেবা করা;
১৩. সালাম আদান-প্রদান করা;
১৪. একতা ও সংঘবদ্ধতা;
১৫. সত্য ও ন্যায়ের প্রচার-প্রতিষ্ঠা;
১৬. অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ;
১৭. শিক্ষা দান ও গ্রহণ;
১৮. মেহমানদারি;
১৯. বিবাহশাদী করা, আত্মীয়তা রক্ষা করা ও পারিবারিক জীবন-যাপন করা;
২০. লেনদেন, ধার-করজা প্রদান;
২১. সদাচার ও শিষ্টাচার;
২২. বন্ধুত্ব ও ভালবাসা;
২৩. মসজিদে সলাত আদায়;
২৪. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া, কাফন-দাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা; এবং
২৫. সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ।

মহান আল্লাহ্ মু'মিনকে সৌন্দর্য ধারণ করতে বলেছেন। আল্লাহ্ আল-কুর'আনে বলেন :

১. "হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সৌন্দর্য গ্রহণ করো।"[১]

২. "হে নবী! বলুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব সৌন্দর্য ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো কে তাদের জন্যে হারাম করলো?"[২]

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল-আ'রাফ, ৩১।
[২] আল-কুর'আন : সূরা আল-আ'রাফ, ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩."পৃথিবীতে যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম আছে, সেগুলো দিয়ে আমরা পৃথিবীর সৌন্দর্য বিধান করেছি।"[১]

৪. "সম্পদ ও সন্তান পার্থিক জীবনের সৌন্দর্য।"[২]

(গ) মহানবী (সাঃ)-এর যুগে ইসলামী সংস্কৃতি

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচার : রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর নবুওয়াতের প্রথম তেরটি বছর শুধু দ্বীনের তাবলীগ করেছিলেন, তাবলীগকে তাঁর নবুওয়াতের প্রধান দায়িত্ব স্থির করে নিয়েছিলেন। দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে জুল্ম, নির্যাতন, ঠাট্টা, বিদ্রুপ আর বহুবিধ হুমকীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তথাপি দ্বীন প্রচারের মহান কাজ থেকে তিনি বিরত হননি। মক্কা থেকে মদীনায় এসেও জিহাদের পাশাপাশি তাবলীগের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। মদীনায় রাষ্ট্র পরিচালনার শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়েছেন। নবীর (সাঃ) জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্নভাবে কাজ করে গেছেন-

দ্বীন প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকূল পরিবেশ না থাকায় নবী (সাঃ) তিন বছর গোপনে দা'ওয়াতী কাজ করেন। এতে নিজ পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের মধ্য হতে বাছাই করা কিছু লোকের নিকট দা'ওয়াত পেশ করেন। দা'ওয়াতের ফলে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদেরকেও গোপনে দ্বীন প্রচারের অনুমতি দেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচারের অনুমতি এলে নবী (সাঃ) প্রথমে নিজ আত্মীয়দের নিকট প্রকাশ্যে দা'ওয়াত পেশ করেন। প্রকাশ্য তাবলীগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নবী (সাঃ) একদিন (আরবের প্রচলিত প্রথানুসারে) সাফা পাহাড়ের উপর উঠে "ইয়া সাবাহ, ইয়া সাবাহ" অর্থাৎ 'হায় সকাল, হায় সকাল' বলে আওয়াজ দিয়ে কুরাইশ গোত্রদের সমবেত করে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও ক্বিয়ামাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দা'ওয়াত দেন। পরবর্তী পদক্ষেপে নবী (সাঃ) প্রকাশ্যে যাবতীয় শিরকের বিরুদ্ধে জোড়ালো যুক্তি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। ফলে মক্কার অধিবাসীরা ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কোমড় বেঁধে লাগে। প্রকাশ্যে তাবলীগ করার কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্জের মৌসুম সমাগত হলে রাসূলের কাছে দ্বীন প্রচারের এক সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়। কেননা সে সময়ে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মক্কায় লোকজন জমায়েত হবে আর এ সুযোগে দ্বীনের দা'ওয়াত সহজেই সমগ্র আরব জাহানে ছড়িয়ে পড়বে। এ প্রেক্ষাপটে মুশরিকরাও রাসূলের দা'ওয়াত ও তাবলীগকে ব্যর্থ করার জন্য নানা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ) দ্বীনের দা'ওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। ফলে আরবের বিভিন্ন গোত্র প্রধান, প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। নবী (সাঃ) কোথাও কোন সফরে বের হলে, যাওয়ার পথে এবং প্রত্যাবর্তনকালেও পথে পথে যেসব লোকের সাক্ষাত মিলত তাদের নিকট দ্বীনের দা'ওয়াত দিতেন। কখনো কোন অঞ্চলে অবস্থান করলে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাত এবং তাদের কাছে দ্বীনের দা'ওয়াত পেশ করতেন। পরিস্থিতি নাজুকতার কারণে রাতের অন্ধকারেও দা'ওয়াতী কাজ পরিচালনা করেছেন। কোথাও কোন মজলিস দেখতে পেলে সেখানে

---

[১] আল-কুর'আন : সূরা আল-আ'রাফ, ৭।

[২] আল-কুর'আন : সূরা আল-কাহ্ফ, ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে দ্বীনের দা'ওয়াত পেশ করেছেন। বিভিন্ন গোত্র, প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তির নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেছেন। স্থানীয় গোত্রপতি যারা ইসলাম কবুল করতেন তাদের মাধ্যমে নিজ গোত্র ও তাঁর আশেপাশের লোকদের নিকট দ্বীন প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) কোন অভিযানকালে বা যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পর প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাবলীগ করেছেন। সর্বদা অবতীর্ণ ওয়াহীর বিধান মোতাবেক দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। দা'ওয়াতী পত্র দিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান যেমন– পারস্যের বাদশা খসরু পারভেজ, বাইজাইনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, দামেস্কের বাদশা গাসসানি, হাবশার বাদশা নাজ্জাশী, আম্মানের বাদশা যেফারের নিকট দূত প্রেরণ করেছেন। দা'ওয়াতী কাজের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবীদের প্রেরণ করেছেন। এক কথায়, ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে নবী (সাঃ) নিরলসভাবে সব ধরনের প্রচেষ্টাই চালিয়েছেন এবং তিনি সফলও হয়েছেন।

কুর'আন মজীদ সংরক্ষণ : নবী (সাঃ) এর বাণী- "তোমরা আমার কোন কথাই লিখবে না। কুর'আন ছাড়া আমার কাছ থেকে কিছু লিখে রাখলে তা মুছে ফেল।"[১] নবুওয়াতের প্রথম দিকে যখন কুর'আন মজীদ অবতীর্ণ হচ্ছিল, তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য বহু 'ওয়াহী লেখক' নিযুক্ত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি কোন আয়াত বা সূরাহ অবতীর্ণ হলেই তিনি তা সাহাবীদেরকে মুখস্ত পড়ে শুনাতেন এবং উক্ত ওয়াহী লেখকদের দ্বারা তা লিখিয়েও রাখতেন। ফলে রাসূলের জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত কুর'আন মজীদ পূর্ণ লিখিত ও সংরক্ষিত রূপ লাভ করে। ওয়াহী লেখক ছাড়া অন্যান্য সাহাবীরাও নিজস্বভাবে কুর'আনের আয়াত লিখে রাখতেন।[২] রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যুগে কুর'আন মজীদ মূলত চারটি পন্থায় সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছিল : কুর'আন মুখস্ত করার মাধ্যমে, কুর'আন চর্চা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে, কুর'আনের বাস্তব অনুসরণ এবং কুর'আন মজীদ লিখে রাখার মাধ্যমে।[৩]

হাদীস সংরক্ষণ : কুর'আন মজীদের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় নবী (সাঃ) প্রথমাবস্থায় হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পরে এর অনুমতি দিয়েছেন। তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন : "তোমরা 'ইল্‌মে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখো"[৪] ফলে দেখা গেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যুগেই সাহাবীগণ কর্তৃক হাদীস মুখস্তের পাশাপাশি হাদীসের বিরাট লিখিত সম্পদ প্রস্তুত হয়েছিল। সাহাবীগণ নিজস্ব উদ্যোগে তা লিখে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।[৫] নবী (সাঃ)-এর যুগে কুর'আন মজীদের ন্যায় নবীর সুন্নাহ তথা হাদীসও চারটি পন্থায় সংরক্ষিত হয়েছিল : মুখস্ত করার মাধ্যমে, হাদীস চর্চা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে, হাদীসের বাস্তব অনুসরণ এবং হাদীস লিখে রাখার মাধ্যমে।[৬]

---

[১] *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা/৭৭০২।

[২] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

[৩] মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, দারুল কিতাব, ২০০০, পৃ. ১৭২-১৯৫।

[৪] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩।

[৫] নবী (সাঃ) এর যুগে হাদীসের লিখিত সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রমাণাদির বিবরণ দেয়া আছে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৬৫-১৯৪।

[৬] এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১০৫-১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : ইসলামী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান হলো মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত মাদরাসা 'দারুল আরকাম'।[১] এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং নবী (সাঃ)। এ মাদরাসার উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন হযরত আবূ বকর, হযরত 'উমর, হযরত 'আলী, হযরত 'উসমান (রাঃ) সহ প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণ।[২] পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদানের জন্য তিনি কতিপয় সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করেন।[৩] ইসলাম গ্রহণকারী নবীন ও প্রবীণ মুসলমানদের দারুল আরকামেই কুর'আন ও দ্বীনের শিক্ষা দেয়া হত।[৪] নবী (সাঃ)-এর ঐতিহাসিক হিজরতের পরবর্তী সময়ে মসজিদে নবূবী নির্মাণ করার পর একে ইবাদত খানার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[৫] পরে মসজিদে নবূবী একটি বিশ্বদ্যিালয়ে পরিণত হয়। সেখানে দিন-রাত দ্বীনী শিক্ষা দেয়া হত। আল্লামা ইবনু আবদুল বার বলেন : "তামীম প্রতিনিধি দলের সত্তর কি আশি জন লোক ইসলাম কবুল করে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করে। এ সময় তারা কুর'আন ও দ্বীন শিক্ষা করছিল।"[৬] হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) বলেন, মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেই কুর'আন শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁকে কোন একজন আনসারীর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হত। মসজিদে নবূবীতে সর্বক্ষণ কুর'আন শিক্ষাদান ও তিলাওয়াতের শব্দ এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, অবশেষে নবী (সাঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করতে হয়েছে যে, সবাই যেন আরও আস্তে কুর'আন পাঠ করে, যাতে পরস্পরের তিলাওয়াতে কোন অসুবিধা না হয়।[৭] রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই মদীনাতে ইসলামী সংস্কৃতির নিদর্শন স্বরূপ নয়টি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেগুলোর প্রত্যেকটিতেই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর কুর'আন শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা ছিল। 'আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল বলেন : "আনসারগণ আমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর সুন্নাতের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।"[৮] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন : "শ্রমজীবি ও পেশাবলম্বী লোকেরা রাতের অন্ধকারে স্বীয় শিক্ষকদের নিকট চলে যেতেন এবং সেখানে সকাল পর্যন্ত তারা পড়াশুনার কাজে লিপ্ত থাকতেন।" বলা বাহুল্য, এসব কেন্দ্রে কুর'আন ও ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করা হত।[৯]

কাব্য-সাহিত্য চর্চা : নবী (সাঃ)-এর যুগে কবি সাহিত্যিকদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। জাহিলী যুগের কবিরা মুসলিম হওয়ার পর অশ্লীল কাব্য রচনা পরিত্যাগ করে ইসলামী ভাবধারার কবিতা

---

[১] **দারুল আরকাম :** নবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বিশিষ্ট সাহাবী আরকাম বিন আবুল আরকাম (রাঃ)-এর বাড়িতে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কায় নও মুসলিমদের ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি গড়া হয়। (ড. আব্দুস সালাম হারুন, সিরাতে ইবনে হিশাম (সংক্ষিপ্ত), কুয়েত দারুল বহুসুল ইসলামিয়া, ১৯৮৪, পৃ. ৪৯)

[২] ড..মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪৩।

[৩] ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ১৩।

[৪] *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

[৫] *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[৬] *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

[৭] *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩।

[৮] *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

[৯] *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করতে শুরু করেন। ফলে তারা কবিতা রচনার মাধ্যমে নবী (সাঃ)-এর মন আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত, কা'ব বিন মালিক এবং 'আবদুল্লাহ্ ইবনু রাওয়াহ (রাঃ) প্রমুখ কবি সাহাবী ছিলেন নবী (সাঃ)-এর সভাকবি। তাঁদের কবিতা হিকমত ও পাণ্ডিত্যের জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। নবী (সাঃ) মুগ্ধ হয়ে দীর্ঘ সময় তাঁদের কবিতা শুনতেন। তাঁরা ইসলাম ও নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের রচিত কবিতাসমূহের জবাব দিতেন ব্যঙ্গাকারে রচিত কবিতার মাধ্যমে।[১]

দ্বীন প্রচারের নির্দেশ : নবী (সাঃ) সাহাবীদেরকে ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় কথা, আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনতে এবং তা মুখস্ত রাখতে ও অন্যের নিকট তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে আদেশ করেছেন। তিনি সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন : "আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অপরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে।"[২] "তোমরা আমার পক্ষ হতে (কুর'আন ও সুন্নাহর) একটি কথা হলেও পৌঁছে দাও।"[৩] সাহাবীগণ নবী (সাঃ)-এর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন।

(ঘ) খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ইসলামী সংস্কৃতি

আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগ (৬৩২-৬৩৪ খ্রী.)

নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)।[৪] তাঁর সোয়া দুই বছরের স্বল্প মেয়াদী শাসনামলে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির বিকাশে চেষ্টা-সাধনার যে গগণস্পর্শী পিরামিড রচিত হয়েছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর উদ্ভুত ভণ্ড নবীদের তিনি সফলভাবে প্রতিরোধ করেন।[৫]

কুর'আন সংকলন ও হাদীস সম্পর্কে আবূ বকর (রাঃ)-এর ভূমিকা : নবূওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফিযে কুর'আন মুজাহিদ শহীদ হন। বিশেষত ইয়ামামার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অধিক সংখ্যক হাফিযে কুর'আন শাহাদাত বরণ করায় দায়িত্বসম্পন্ন সাহাবীদের মনে কুর'আন মজীদের বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়। তাই অবিলম্বে কুর'আন মজীদ সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়। কুর'আন মজীদের আয়াত ও সূরাহ্সমূহ বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং নবী (সাঃ)-এর নির্দেশে তা সঙ্গে সঙ্গেই নির্দ্দিষ্ট সাহাবীদের দ্বারা লিখিত হয়েছে। খেজুর পাতা, উটের

---

[১] *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১।
[২] *মুসনাদ-এ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হা/৪১৫৭।
[৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হা/৩২০২।
[৪] কে আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৩৮; *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।
[৫] কে আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৩৮; *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

চামড়া, অস্থি, পাথর ও কাঠের উপরই তা সুস্পষ্টভাবে লিখা ছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নির্দেশে তা একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় ও একখানা সুসংবদ্ধ গ্রন্থের রূপ দান করা হয়। ইসলামী দৃষ্টিতে এটা যে কত বড় অবদান ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।[১] আল্লামা সূয়ুতী হারিস মুহাসিবী সূত্রে বলেন : রাসূলের যুগে বিক্ষিপ্ত আকারে কুর'আনের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আবূ বকর (রাঃ)-এর নির্দেশে হযরত জায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) সেগুলোকে একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে এক সূতায় গেঁথে দেন।[২]

নবী (সাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সতর্কতাপূর্ণ। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন : কোন হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী ও সন্দেহমুক্ত না হয়ে তা বর্ণনা করা ঠিক নয়। তিনি নিজে কখনো কোন হাদীসকে তাঁর একাধিক সমর্থক ও সাক্ষী না পেলে গ্রহণ করতেন না। সম্ভবত তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম হওয়ার এটাও অন্যতম কারণ।

ইসলামী শিক্ষা ও ফতোয়া বিভাগ স্থাপন : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে মুরতাদদের মোকাবেলা করার পর নবী (সাঃ)-এর অনুকরণে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু করেন। কুর'আন মজীদ ও দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।[৩] তিনি ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত 'উমর, হযরত 'উসমান, হযরত 'আলী, 'আবদুর রহমান বিন আওফ, মুয়াজ বিন জাবাল, উবাই ইবনু কা'ব, জায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) প্রমূখ শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাবিদগণ এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জনগণের জিজ্ঞাসিত ফতোয়ার জবাব প্রদান তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল।[৪]

ইসলাম প্রচার : ইসলাম প্রচারে হযরত আবূ বকর (রাঃ) শুরু থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দেয়ায় সমগ্র আরবে ইসলাম প্রচারের বলিষ্ঠ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। চর্তুদিক প্রেরিত মুজাহিদদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রসমূহে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর জন্য তিনি বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠাতেন। তাঁদের মাধ্যমে এ কাজ পূর্ণ একাগ্রতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন হওয়ার কারণে দূর নিকটের সকল মূর্তিপূজক ও খ্রিস্টান ধর্মালম্বী ইসলাম কবুল করে। ইরাক, আরব ও সিরিয়া সীমান্তবর্তী আরব গোত্রসমূহ হযরত খালিদ (রাঃ)-এর দা'ওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।[৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ রক্ষার উপদেশ : হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে ইসলামী আদর্শ রক্ষা ও প্রসারের জন্য বিশেষ বিশেষ অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণকালে সৈন্যদেরকে উপদেশ দিতেন। যেমন, সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণের সময় তিনি সেনাধ্যক্ষকে এ মর্মে

---

[১] *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-২০১।

[২] *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

[৩] ড. মোহাম্মদ আজহার আলী, রেজিনা খানম ও মুহাম্মদ ইবনে ইনাম, *ইসলাম ও শিক্ষা*, পৃ. ৬৬, বি-এড. প্রোগ্রাম সেমিষ্টার ১, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর: *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।

[৪] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১০৭-১০৮।

[৫] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপদেশ দেন : 'তোমরা এমন লোকদের সাক্ষাত পাবে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মনিয়োগ আছে। তাঁদের উপর আক্রমণ করবে না। এছাড়া আরও দশটি উপদেশ তোমাদেরকে দিচ্ছি : কোন স্ত্রী, শিশু ও বৃদ্ধ লোককে হত্যা করবে না, ফলবান গাছ কাটবে না, কোন জনপদ বা আবাদ স্থানকে জনশূণ্য করবে না। ছাগল এবং উট প্রয়োজন ছাড়া জবেহ করবে না। খেজুর বাগানে অগ্নিসংযোগ করবে না। গণীমতের মাল আত্মসাৎ করবে না এবং কাপুরুষ ও সাহসহীন হবে না।'[১]

অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ : হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর আমলে ইসলামী সমাজে বিদ'আতের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। তথাপি কোথাও তেমন কিছু পরলক্ষিত হলেই তিনি অনতিবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হতেন।[২]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অমুসলিমদের অধিকার রক্ষা : নবী (সাঃ)-এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্রে যে সব অমুসলিমকে আশ্রয়দান বা লিখিত চুক্তিনামার মাধ্যমে যাদের সাথে বিশেষ সন্ধি করা হয়েছিল, হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাদের যাবতীয় অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করেন। একইভাবে খিলাফতের আমলে বিজিত দেশসমূহে অমুসলিম যিম্মী প্রজাদের তিনি মুসলিম প্রজাদের প্রায় সমান অধিকার দান করেছিলেন। 'হীরা'র অঞ্চলের খ্রিস্টান অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তিনামা সাক্ষরিত হয়েছিল, তা নিম্নরূপ : "তাদের খানকাহ ও গীর্জাসমূহ ধ্বংস করা হবে না, প্রয়োজনের সময়ে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন প্রাসাদও চূর্ণ করা হবে না। ঘন্টা বাজানো ও শিংগা ফুকাতে বাধা দেয়া হবে না। তাদের বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে ক্রুশ মিছিল বের করতে নিষেধ করা হবে না।" এটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জল নিদর্শন।[৩]

হযরত 'উমর (রাঃ)-এর যুগ (৬৩৪-৬৪৪ খ্রী.)

ইসলামী খিলাফত বিস্তার : হযরত 'উমর (রাঃ)-এর দশ বছরের শাসনামলে ইসলামী খিলাফত চরম উৎকর্ষ ও অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করে। তৎকালীন রোম ও পারস্য দুটি পরাশক্তি মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁর সময়ে যে সব দেশ ও শহরের উপর ইসলামী খিলাফতের পতাকা উত্তোলিত হয়, সে সব স্থানে জুলুম-নির্যাতনের কোন চিহ্নও পাওয়া যায়নি। মুজাহিদদেরকে আদেশ করা হত যে, তাঁরা যেন কোন শিশু, নারী ও বৃদ্ধের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। নরহত্যা তো দূরের কথা, সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজি পর্যন্ত কর্তন করাও ইসলামী সেনাদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। খলীফাগণ বিজিত অঞ্চলে ন্যায়পরায়ণতা ও সৌজন্যের যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন, তা প্রত্যক্ষ করে সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হত। যে সব এলাকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে সব এলাকার মানুষ ইসলামী খিলাফতী শাসনকে অপূর্ব রহমত বলে মনে করত এবং এই রহমত অবিলম্বে তাদের দেশ ও জাতির উপর বর্ষিত হবার জন্য তারা রীতিমত প্রার্থনা করত। এমনকি, তারা কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বিজয়ী মুসলিমদেরকে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে স্বয়ং সিরিয়াবাসী অমুসলিম জনগণই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুসলিমদের পক্ষে সংবাদ সরবরাহ ও খোঁজ-খবর দেয়ার কাজ করেছে। ইরাক বিজয়-কালে তথাকার অনারব জনতা ইসলামী সৈন্যদের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে

---

[১] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬।

[২] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

[৩] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপক্ষের গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ দেয়। হযরত 'উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমান্ত হতে মিশর ও সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকার উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। হযরত 'উমর (রাঃ)-এর খিলাফত ছিল পূর্ণ মাত্রায় একটি গণ-অধিকার-ভিত্তিক রাষ্ট্র। তাঁর আমলে দেশের যাবতীয় সমস্যা মজলিসে শুরার সম্মুখে পেশ করা হত এবং কুর'আন-সুন্নাহ ও প্রথম খলীফার অবলম্বিত রীতিনীতিকে সামনে রেখে প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করা হত।[১] খিলাফতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ, শাসন ব্যবস্থার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা, যিম্মীদের অধিকার রক্ষা, শহর নির্মাণ ও সামরিক ব্যবস্থা সহ যাবতীয় দিক অত্যন্ত সুন্দর ও বলিষ্ঠরূপে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির এক উজ্জল নিদর্শনের সাক্ষ্য বহন করছিল।

দ্বীন প্রচারে অবদান : হযরত 'উমর (রাঃ) ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের কাজে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। কোন অমুসলিমকে মুসলিম বানাতে তিনি কখনো তরবারি কিংবা রাষ্ট্র-শক্তি প্রয়োগ করেননি; বরং ইসলামী জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য, এর অতুলনীয় অনুপম সৌন্দর্য এবং অন্তর্নিহিত মর্মস্পর্শী ভাবধারায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেই তিনি লোকদেরকে মুসলিম বানাতে চেষ্টা করতেন। একদা তিনি তাঁর কৃতদাসকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করায় তিনি বললেন : "দ্বীন ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে কোন জবর-দস্তি নেই।" যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সর্বশেষ সুযোগ হিসেবে তিনি ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাতেন। কারণ সেই মুহূর্তেও কেউ ইসলাম কবুল করলে তার সাথে যুদ্ধ করা হারাম হয়ে যায়। যুদ্ধ ও রক্তপাত পরিহার করার জন্য এটা ছিল মুসলমানদের শেষ প্রচেষ্টা। হযরত 'উমর (রাঃ) মুসলমানগণকে ইসলামী নৈতিকতার জীবন্ত প্রতীকরূপে গড়ে তুলেছিলেন। ফলে যে পথ ও জনপদের উপর দিয়েই তাঁরা অগ্রসর হতেন, সেখানেই তাঁদের নৈতিক-চরিত্র ও মধুর ব্যবহারের ছাপ প্রতিফলিত হত এবং জনতা তাতে মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে ইসলাম কবুল করত। রোমান সম্রাটের রাষ্ট্রদূত ইসলামী সৈন্য-কেন্দ্রে আগমন করে সেনাপতির সরল জীবন-যাত্রা, অকপটতা ও উদার ব্যবহার দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। মিসরের জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের কথা লোকমুখে শুনতে পেয়ে এতদূর মুগ্ধ হন যে, দুই সহস্র জনতাসহ অনতিবিলম্বে ইসলাম কবুল করেন।[২]

দ্বীন শিক্ষায় অবদান : মুসলমানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের জন্য হযরত 'উমর (রাঃ)-এর প্রচেষ্টা প্রথম খলীফার আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। ইসলামের মূলসূত্র কুর'আন মজীদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার মূলে 'উমর (রাঃ)-এর প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। খলীফা হয়ে তিনি ইসলামী শিক্ষার চর্চা আরো জোরদার করেন। এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক বেতন নির্ধারণ করা হয়। সিরিয়ায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে কুর'আন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। কুর'আন মজীদকে পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভূলরূপে অধ্যয়ন করার জন্য চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে কুর'আন চর্চা শুরু হয়ে যায়। তাঁর সময় মসজিদ ভিত্তিক পঠনের সাথে লিখনেরও ব্যবস্থা করা হয়। কুর'আন বিশুদ্ধভাবে সঠিক উচ্চারণ

---

[১] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৯।

[২] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

সহকারের পাঠের জন্য তিনি আরবী সাহিত্য ও আরবী ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে ফরমান জারি করেন।[১]

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় কুর'আনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীসের খেদমত করার ব্যাপারেও হযরত 'উমর (রাঃ)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি নবী (সাঃ)-এর বহু সংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করে প্রদেশসমূহের শাসনকর্তাদের নামে পাঠিয়েছিলেন এবং সাধারণ্যে তা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সাহাবীকে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য কুফা, বসরা ও সিরিয়া প্রভৃতি এলাকায় তিনি প্রেরণ করেছিলেন। খলীফা 'উমর (রাঃ) হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[২]

হাদীসের পরই হচ্ছে ফিকাহ্‌র স্থান। খলীফা 'উমর (রাঃ) নিজেই বিভিন্ন খুতবাহ্‌তে প্রসঙ্গ ক্রমে ফিকাহের মাস'আলা মাসা'ইল বর্ণনা করতেন এবং দুরবর্তী স্থানের শাসকদের নামেও ফিকাহ্‌র জরুরী মাস'আলাসমূহ সময় সময় লিখে পাঠাতেন। যে সব বিষয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হত তা সাহাবীদের প্রকাশ্য মজলিসে তিনি পেশ করতেন ও যথাসম্ভব সর্বসম্মতভাবে মীমাংসা করিয়ে নিতেন। তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের ব্যাপক প্রচারের জন্য ফিকাহ্‌বিদগণকে উচ্চমানের বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩]

হযরত 'উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র মসজিদ নির্মাণ এবং তাতে ইমাম ও মুয়ায্যিন নিযুক্ত করা হয়। লোকদের সুবিধার্থে হেরেম শরীফ অধিক প্রশস্ত করে দেয়া হয়। মসজিদে নবূবীকেও অনেক বড় করে তৈরি করা হয়।[৪] সংক্ষেপে বলতে গেলে, হযরত 'উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপক হয়েছিল এবং ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল।

হযরত 'উসমান (রাঃ)-এর যুগ (৬৪৪-৬৫৬ খ্রী.)

খিলাফত বিস্তার : হযরত 'উসমানের খিলাফতের সময় ত্রিপলি, আলজিরিয়া ও মরক্কো, কাবুল, হিরা, সিজিস্তান, নিশাপুর এবং ভূ-মধ্য সাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপের উপর মুসলিম বিজয়ের পতাকা উড্ডীন হয়। বহু দেশ নিয়ে গঠিত বিশাল এলাকা ইসলামী খিলাফতের অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় ইসলামী রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত হয়। ইসলামী হুকুমাতের কর্তৃত্ব রক্ষায় হযরত 'উসমান (রাঃ)-এর সামুদ্রিক বিজয়াভিযানের বিরাট অবদান রয়েছে। তাঁর নিখুঁত সমর পরিকল্পনার ফলে রোমান সম্রাটের পাঁচশোটি যুদ্ধ জাহাজ সমন্বিত বিশাল নৌ বাহিনীকে চরম পরাজয় বরণ করতে হয়।[৫]

দ্বীন শিক্ষা ও প্রচার : হযরত 'উসমান (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর পূর্ববর্তী খলীফাদের অনুকরণে মসজিদে মসজিদে কুর'আন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাদানের নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন

---

[১] কে আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৬৫ *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮; *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

[২] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

[৪] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১।

[৫] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানে মসজিদ নির্মাণ ও পর্যাপ্ত সাহাবীকে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন।[১] হযরত 'উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে পরিচালিত প্রত্যক্ষ জিহাদে যে সব অমুসলিম বন্দী হয়ে আসত, তাদের সামনে তিনি নিজের ধর্মের ব্যাখ্যা ও তার সৌন্দর্য বর্ণনা করতেন এবং দ্বীন ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাতেন। ফলে অসংখ্য লোক ইসলাম কবুল করে। বিধর্মীদের নিকট ইসলাম প্রচার ছাড়াও স্বয়ং মুসলিম জনগণের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্যও তিনি ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বীন সম্পর্কিত জরুরী মাসা'ইল তিনি নিজেই জনগণকে জানিয়ে দিতেন। দ্বীনের কোন বিষয় তাঁর অজানা বা অস্পষ্টট থাকলে তা বিশেষজ্ঞ সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করতেন এবং তদনুযায়ী লোকদের আমল করার নির্দেশ দিতেন।[২]

কুর'আন সংকলনে অবদান : হযরত 'উসমানের বড় অবদান হলো কুর'আন সংকলন সম্পন্ন করা। এটা ছিল কুর'আন মজীদকে সর্বপ্রকার মতবিরোধ ও বিকৃতি হতে চিরকালের জন্য সুরক্ষিত করে তোলার এক অতুলনীয় কার্যক্রম। আর্মানিয়া ও আযারবাইজান অভিযানে মিশর, সিরিয়া ও ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলের মুজাহিদগণ একত্রিত হয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন নও-মুসলিম, অনারব বংশোদ্ভুত এবং আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ। হযরত হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-ও এই জিহাদে যোগদান করেছিলেন। তিনি নিজে এই দুই জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুসলিম মুজাহিদদের কুর'আন পাঠের ধরন ও ভংগীতে মারাত্মক রকমের পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। দেখা গেল, প্রত্যেক এলাকার লোকেরা নিজস্ব ইচ্ছানুসারে কুর'আন পড়ে এবং উহাকেই কুর'আন পড়ার একমাত্র ধরন মনে করে নিয়েছে। যুদ্ধ শেষে তিনি মদীনায় এসে খলীফা 'উসমান (রাঃ)-এর কাছে বিষয়টি জানালেন। তিনি গভীর আশংকা প্রকাশ করে বললেন, অনতিবিলম্বে এ বিরোধ ও পার্থক্য সম্পূর্ণ দুরীভূত করে এক ও অভিন্ন ধরন ও ভঙ্গিতে কুর'আন পাঠের ব্যবস্থা না করা হলে মুসলিম সমাজও খ্রিস্টান রোমানদের ন্যায় আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাপারে নানা বিভেদ ও বিসম্বাদের সৃষ্টি করে ছাড়বে। হযরত হুযাইফাহ (রাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণে হযরত 'উসমান (রাঃ) এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট হতে কুর'আন মজীদের মূল গ্রন্থ আনিয়ে হযরত জায়িদ ইব্‌ন সাবিত, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবাইর ও সায়াদ ইবনুল 'আস (রাঃ) কর্তৃক এর বহু সংখ্যক কপি তৈরি করে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং একেই কুর'আন মজীদের চূড়ান্তরূপ হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণের জন্য সর্ব সাধারণকে নির্দেশ প্রদান করেন। সেই সঙ্গে লোকদের ব্যক্তিগতভাবে লিখে রাখা কুর'আনের সব পাণ্ডুলিপি নিশ্চিহ্ন করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে 'উসমান (রাঃ)-এর এই মহান অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।[৩]

হযরত 'আলী (রাঃ)-এর যুগ (৬৫৬-৬৬১ খ্রী.)

হযরত 'উসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর হযরত 'আলী (রাঃ) খিলাফতে আসীন হন। তাঁর খিলাফতের সময় মুসলিম সমাজে অরাজকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দেয়া সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়তার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন ও ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রচার-প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন।

---

[১] *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[২] *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

[৩] *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৮; মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে প্রথম তিনজন খলীফার আমলেও তিনি কুর'আন-হাদীস শিক্ষাদান ও দ্বীন প্রচারের কাজে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তাঁর নিজের খিলাফতের সময়ও নানা ফিতনা-ফাসাদ সত্ত্বেও ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। ফলে তিনজন খলীফার তুলনায় 'আলী (রাঃ) অধিক হাদীস বর্ণনার সুযোগ লাভ করেন। হাদীস গ্রন্থাবলীতে তাঁর সূত্রে ৫৮৬টি হাদীস বর্ণিত আছে।[১] 'আলী (রাঃ) তাঁর লিখিত হাদীস সম্পদকে 'সহীফা' নামে উল্লেখ করতেন এবং এই 'সহীফা' তাঁর তরবারীর খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতেন। এই হাদীসসমূহ হতে ব্যবহারিক জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাস'আলা জানা যায়।[২]

(ঙ) উমাইয়া যুগে ইসলামী সংস্কৃতি (৬৬১-৭৫০ খ্রী.)

ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়াগণ ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইসলামী খিলাফতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিহার করে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মাধ্যমে মোট ১৪ জন শাসক দ্বারা প্রায় ৯০ বছর উমাইয়া শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই শাসকবর্গের মধ্যে কারো কারো বিরুদ্ধে শর'য়ী অভিযোগ থাকলেও অধিকাংশ শাসক ইসলামের খিদমাতে সুনাম অর্জন করেছিলেন।[৩] সাম্রাজ্য বিস্তার, হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মসজিদ-মক্তব-মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মতো খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন উমাইয়া শাসনামলেও অব্যাহত থাকে।[৪]

উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে 'উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রহ.) (৭১৭-৭২০ খ্রী.) সর্বাধিক প্রশংসাযোগ্য শাসক ছিলেন।[৫] তিনি মুসলিম জাহানের খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেই ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও সমৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি রাজ্যের প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে ফরমান পাঠান : "প্রশাসকগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকার মসজিদসমূহে নিজেরা এবং আলিমদের দ্বারা আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের প্রসার ঘটাবেন। কেননা আলোচনা ছাড়া নবী (সাঃ)-এর বাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।"[৬] তিনি মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি কাযী আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাযমকেও এরূপ ফরমান পাঠান : "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস, তাঁর সুন্নাত কিংবা 'উমরের বাণী, অথবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায়, তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে নাও। কেননা আমি 'ইল্মে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশংকা করছি।" সা'দ ইব্ন ইবরাহীম বলেন, 'উমর ইব্ন 'আবদুল আযীয আমাদের হাদীস সংগ্রহের নির্দেশ দিলে আমরা সংগৃহীত হাদীসসমূহ লিখে ফেলি। ফলে উক্ত সংগৃহীত হাদীসের সংকলিত কপিসমূহ সাম্রাজ্যের সীমান্তাঞ্চল পর্যন্ত পাঠিয়ে দেন। এ সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে আরও ফরমান জারি করা হয় যে, যারা পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করে হাদীস ও ফিকাহ্-এর চর্চা এবং

---

[১] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১৭০।

[২] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১৬৫, ১৭০-১৭১।

[৩] কে আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৩২০-৩২৫।

[৪] ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭ শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৬১।

[৫] মাওলানা সাইয়্যিদ রিয়াসাত আলী নদভী, *ইসলামী নিজামে তা'লীম*, দারুল মুসান্নিফীন, পাকিস্তান, ১৯৯২, পৃ. ২৭।

[৬] ইবনুল জাওযী, *সীরাতে ইবনে আবদুল আজিজ*, পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন তাদেরকে সাহায্য হিসেবে বায়তুল মাল থেকে মাসিক একশ দিনার দেয়া হবে।[১]

উমাইয়া শাসনামলে সব মসজিদে অথবা মসজিদ সংলগ্ন চত্বরে মাদরাসা স্থাপিত হয়। সমগ্র সাম্রাজ্যর অনেক মসজিদে সাধারণ শ্রেণীর মাদরাসা এবং অনেক মসজিদকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী সংস্কৃতির পথ প্রদর্শক হিসেবে উমাইয়ারাই সর্ব প্রথম দামেশক নগরীকে শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করে। অতঃপর শাসকরা তাদের সমগ্র বিজিত অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে।[২]

উমাইয়া খলীফাগণ ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সে সময় মক্কা, মদীনা, হেজাজ, ইরাকের বসরা ও কুফা, সিরিয়ার দামেশক ও উত্তর আফ্রিকার মিশর ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুবিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৩]

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক দামেশকে একটি বড় ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করেন। ৬৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি বিরাট রাজকীয় গ্রন্থাগারও স্থাপন করেন, সেখানে সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের লেখা মূল্যবান গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হয়।[৪]

(চ) আব্বাসীয় যুগে ইসলামী সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮ খ্রী.):

আব্বাসীয় বংশের মোট ৩৭ জন খলীফা ৭৫০-১২৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৫০৮ বছর মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তন্মধ্যে খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ হতে মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত (৭৫০-৮৪৭ খ্রী) দশজন খলীফার প্রায় একশ বছরের শাসনকালকে আব্বাসীয় বংশের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়।

আব্বাসীয় বংশের এই দীর্ঘ ৫০৮ বছরের শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসার, কুর'আন ও হাদীসের গবেষণা, ফিকাহ্, তাসাউফ, মানতিক, ভূগোল, রসায়ণ, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়। তাঁরা যুদ্ধের পরিবর্তে জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান আহরণের নীতি অনুসরণ করেন। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা বিশ্ব সভ্যতায় অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হন।[৫] আব্বাসীয় খিলাফতকালে ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় যে বিকাশ সাধিত হয় তার কিছুটা উল্লেখ করা হলো :

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : আব্বাসীয় যুগে বিভিন্ন শহরের মসজিদসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীকে মসজিদে আরবী ভাষা, কুর'আন পাঠ, ইসলামী স্মৃতি শাস্ত্র ও দৈনন্দিন ধর্মীয় ব্যবহারিক বিষয় মৌখিকভাবে পাঠদান করা হত। একই সাথে

---

[১] *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০৯।

[২] *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

[৩] ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭ শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৬৯।

[৪] মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৩২।

[৫] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস*, গ্লোব লাইব্রেরী লিঃ, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৭৬; *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী হস্তলিপি, হিসাব বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ ও কবিতাও শেখানো হত। মেয়েদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ গ্রহণে উৎসাহিত করা হত। রাজপরিবার ও অভিজাতঘরের শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করা হত নানান দেশের শিক্ষক। তাঁরা রাজপ্রাসাদে তাদেরকে ধর্ম শিক্ষা, সাধু সাহিত্য এবং কাব্যশিল্প শিক্ষাদান করতেন।[১] আব্বাসীয় শাসনামলের প্রাথমিক যুগে দু'টো মাদরাসা বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী ছিল। সেগুলোর একটি হলো কুফাতে ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মাদরাসা এবং অন্যটি মদীনায় অবস্থিত ইমাম মালিক (র)-এর মাদরাসা।[২] ইমাম শাফে'য়ী ৮২০ সালে মিশরের ফুসতাতে 'আমরের মসজিদে একটি শিক্ষা মজলিসের প্রধান ছিলেন এবং আমৃত্যু প্রতিদিন সকালে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।[৩]

আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রী.) ইসলামী শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্যে সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি মাদরাসা নির্মাণ এবং হাদীস সংকলনে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।[৪] খলীফা আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রী.) বহু মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ ও সংস্কার করেছেন।[৫]

আব্বাসীয় খলীফা হারুন-উর-রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রী.) সময় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার আরো উন্নতি হয়। ইমাম আবূ ইউসুফকে তিনি তার প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন।[৬] খলীফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রী.) উচ্চতর মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ৮৩০ সালে বাগদাদে বায়তুল হিকমাত প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে স্বীকৃত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিভাগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যাপনা, গবেষণা এবং অনুশীলন।[৭] সুতরাং আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

হাদীস গ্রন্থাবলী সংকলন : আব্বাসীয় সোনালী যুগের শেষ প্রান্তে 'ইলমুল হাদীস সংকলনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ সময়েই সংকলিত হয় হাদীসের মৌলিক ছয়টি গ্রন্থ : (১) সহীহুল বুখারী : এটি সংকলন করেন বুখারার বিখ্যাত হাদীস বিশারদ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (৮১০-৭০ খ্রী.)। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে পারস্য, মিশর, ইরাক ও হেজাজ ভ্রমণ করেন এবং এক হাজার ব্যক্তি হতে ৬ লাখ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং সর্বোচ্চ সতর্ককতার সাথে সেগুলো বাছাই করে মাত্র ৭২৭৫টি হাদীস তার সংকলনে স্থান দেন; (২) সহীহ মুসলিম : এটি সংকলন করেন ইমাম বুখারীর ছাত্র নিশাপুরের মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (৮১৭-৮৬৫ খ্রী.); (৩) সুনানে আবূ দাউদ : এটি সংকলন করেন আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইব্ন ইসহাক্ব আল-আসাদী আল-সিজিস্তানী (৮১৭-৮৮৮ খ্রী.); (৪) জামে' আত-তিরমিযী : এটি সংকলন করেন ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (৮২৪-৮৯৩ খ্রী.); (৫) সুনানে নাসায়ী : এটি

---

[১] মূসা আনসারী, *মধ্য যুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩২৭-৩২৮।

[২] *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

[৩] *মধ্য যুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

[৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস*, গ্লোব লাইব্রেরী লিঃ, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৪৮২।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১।

[৭] *মধ্য যুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

সংকলন করেন ইমাম আবূ 'আবদুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব নাসায়ী (৮৩০-৯১৬ খ্রী.); এবং (৬) সুনানে ইবন মাজাহ : আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ কাজভীনী (৮২৪- ৮৮৬ খ্রী.)।

ফিকাহ শাস্ত্র : আব্বাসীয় খিলাফত আমলেই প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাযহাবী ইমামদের আর্বিভাব ঘটে। এ সময় পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের তাগিদে তাদের ধর্ম জ্ঞানের আরেকটি নতুন স্বতন্ত্র কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা আইন বিদ্যার উদ্ভব হয়। এটা এ যুগের ধর্মীয় জ্ঞান বিকাশে আরেকটি বড় অবদান। এ সময় ফিকাহ শাস্ত্রে যে চারজন মহা পুরুষ সর্বাধিক অবদান রেখেছেন তারা হলেন : ইমাম আবূ হানিফা নু'মান বিন সাবিত (৬৯৮-৭৬৮ খ্রী.); ইমাম মালেক বিন আনাস (৭১১-৭৯৫ খ্রী.); ইমাম শাফে'য়ী (৭৬৭-৮২০ খ্রী.); এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (৭৮০-৮৫৭ খ্রী.) (রহিমাহুমুল্লাহ আজমাঈন)।[১]

সাহিত্য চর্চা : আব্বাসীয় আমলে যে বিশাল আরবী সাহিত্য সৃষ্টি হয় তা সমগ্র মধ্যযুগীয় সভ্যতার অক্ষয় সৌধমালা। তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের সম্মিলিত মেধা ও মননের প্রকাশ ঘটে আরবী সাহিত্যে। আরবী সাহিত্যে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয় দশম শতাব্দীর শেষে এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে। এ সময়টি আরবী সুকুমার সাহিত্যের যুগ বলাই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এরূপ সাহিত্য শিল্প কর্মের সূচনা করেন বসরার সাহিত্য সেবীদের প্রধান জাহিজ (মৃ. ৮৬৮ খ্রী.); এর চূড়ান্ত শিল্পরূপ পায় বদিউজ্জামান হামাদানী (৯৬৯-১০৩৮ খ্রী.), নিশাপুরের সায়ালবী (৯৬১-১০৩৮ খ্রী.) এবং বসরার হারিরি (১০৫৪-১১২২ খ্রী.) এর সাহিত্য কর্মে। মাকামা সাহিত্য বিকাশে তৎকাণীন মুসলিম বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য ঐতিহাসিক ছিলেন আবুল ফারাজ ইস্পাহানী (৮৮৭-৯৬৭ খ্রী.)। তিনি আলেপ্পো নগরে বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল আগানী রচনা করে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এ কিতাবটি ছিল তৎকালীল আরবী সাহিত্যের বিশ্বকোষ। ইব্ন খালদুনের মতে পুস্তকটি ছিল আরব রেজিষ্ট্রার, আরবী সুকুমার সাহিত্যমোদীদের শেষ উৎস।[২]

কাব্য চর্চা : আব্বাসীয় যুগের নব কাব্য ধারার পথিকৃৎ ছিলেন পারস্যের অন্ধকবি বাশ্শার বিন বুরদ। আর প্রাথমিক পর্যায়ে নয়া কাব্যধারার বড় প্রতিনিধি ছিলেন আধা পারসী আবূ নুয়াস (মৃ. ৮১০)। রাজ দরবারে হাস্য-রসিক ভাঁড় হিসেবে আবূ নুয়াস সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। আবুল আতাহিয়া (৭৫৮-৮২৮ খ্রী.)-এর কাব্যে আধ্যাত্মিক মানসিকতা, নৈরাশ্যবাদ এবং মৃত্যু চেতনা প্রকটভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি ছিলেন বেদুঈন স্বভাবের কবি। খলীফা হারুন তাকে ৫০ হাজার দিরহাম বৃত্তি মঞ্জুর করেন। দরবারী কবিদের অন্যতম বিখ্যাত কবি ছিলেন আবূ তাম্মাম (মৃ. ৮৪৫ খ্রী.) এবং আবুল আলা আল-মায়ারি। আবূ তাম্মাম দিওয়ানে হামাসা রচনা করে কাব্য জগতে

---

[১] ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৬৯-৭০; *মধ্য যুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৮।

[২] *মধ্য যুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০-৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তার দিওয়ানটি যুদ্ধবীর গাঁথা। এভাবে আব্বাসী যুগে স্তুতিবাদী কাব্য ধারা প্রাধান্য পায়।[১]

আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনা : আব্বাসীয় যুগে আরবী ভাষায় ইতিহাস চর্চা মানব বিদ্যায় এক নবতর দিগন্ত উন্মোচন করে। এ সময় ইতিহাস রচনাশৈলী, উপাত্ত অনুসন্ধান পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক চিন্তন নয়া রূপে বিকশিত হয়। উমাইয়া যুগে ইতিহাস চর্চার সূচনা হলেও আব্বাসী যুগেই ইতিহাস অনুশীলনের জোয়ার উত্থিত হয়। সে সময়ের উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঐতিহাসিক হলেন- কূফা নগরের হিশাম আল-কালবী (মৃ. ৮১৯ খ্রী.); মদিনাবাসী মুহাম্মদ ইসহাক (মৃ. ৭৬৭ খ্রী.); ইবন হিশাম (মৃ. ৮৩৪ খ্রী.); তাবাকাত রচয়িতা ইব্ন সায়াদ; মদিনাবাসী মূসা ইব্ন উকবাহ (মৃ. ৭৫৮ খ্রী.) ও আল ওয়াকেদী (মৃ. ৮২২ খ্রী.); মিশরের ঐতিহাসিক আব্দুল হাকাম (মৃ. ৮৭০ খ্রী.); ইবনুল মোকাফ্ফা (মৃ. ৭৫৭ খ্রী.); ইব্ন কুতায়বাহ; আবূ হানীফা আহমদ ইবন দাউদ দিনাওয়ারী (মৃ. ৮৯৬ খ্রী.); হামজা ইস্পাহানী (মৃ. ৯৬১ খ্রী.); আবূ জাফর মোহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খ্রী); আবুল হাসান 'আলী আল-মাসুদী ও মিসকাওয়াইয়া (মৃ. ১০৩০ খ্রী.) প্রমূখ ঐতিহাসিক।[২]

(ছ) ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি

ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় তাই ইসলামী সংস্কৃতি। জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠা নিয়মাবলীই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতি নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বিভিন্ন। তাই অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে মুসলিম সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

মুসলমানদের মধ্যে কোন বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রাধান্য পেলে তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। কারণ মুসলমান কোন সংস্কৃতি চর্চা করলেই তা ইসলামী সংস্কৃতি হয়ে যায় না। সেই সংস্কৃতি ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যখনই ইসলামী জীবনবোধের বিপরীত কোন আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে দৃশ্যমান হয়েছে তখনই ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ সেটাকে বিদ'আত তথা কুসংস্কার বা বিজাতীয় সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মুসলমানদের অবহেলা ও অসতর্কতার সুযোগে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকৃত সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত হতে থাকলে তাকেও ইসলামী সংস্কৃতির অংশ মনে করা যাবে না। যেমন, মুসলিম রাজা- বাদশাহদের দরবারের কাহিনী, যার সাথে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সংস্কৃতির সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। বিশেষত মোগল ও বাগদাদের রাজতান্ত্রিক মুসলিম বাদশাহের দরবারী সংস্কৃতি। কালক্রমে এ সব সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও এ সংস্কৃতির

---

[১] *মধ্য যুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫।

[২] *মধ্য যুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮-৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এ সংস্কৃতি কিছুতেই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারে না।[১] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ডক্টর হাসান জামান বলেন :

"ইসলামী তমদ্দুনের[২] স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মুসলিম তমদ্দুন ও ইসলামী তমদ্দুনে আসমান যমীন প্রভেদ। মুসলমানদের তমদ্দুন হলেই তা ইসলামী তমদ্দুন না-ও হতে পারে। জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য, বাদশাহী ও সামন্ততান্ত্রিক হাবভাব নানা কারণে মুসলমানদের তমদ্দুনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ইসলামী তমদ্দুনের অংশ বলা যায় না। আব্বাসীয়দের সময় থেকেই ইসলামী তমদ্দুনে সংকীর্ণতা ঢুকে পড়ে। মনে রাখা দরকার যে, তথাকথিত ধর্মীয় শাসক মুখে ইসলামের নাম করে শাসন চালালেই ইসলামী শাসন হবে না। কেবলমাত্র ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সামাজিক ব্যাপারের যোগ থাকলেই ইসলামী সমাজ পাওয়া যাবে না। বাহ্যিক হাবভাব বা পোশাক আশাকই যথেষ্ট নয়। ইসলামী নীতির সঙ্গেই সামাজিক ব্যাপারের সংযোগ হওয়া চাই। ইসলামী জীবনবোধ থেকে পাওয়া মৌলিক ভাবের উপরই নির্ভর করে ইসলামী তমদ্দুনের ও ইসলামী সাহিত্যের মৌলিক ভিত্তি।"[৩]

(জ) ইসলামী সংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতি

আবহাওয়া ও পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন জীবনাচার আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের এক অনুপম নিদর্শন। জীবনাচারের এ পার্থক্যের ফলে স্বাভাবিকভাবেই অঞ্চল ভেদে পৃথক পৃথক সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে। মানুষ স্থানীয়ভাবে বিকশিত এ সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এ স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কিছু কিছু ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষ পারস্পরিক বিভেদ ভুলে একই ধরনের আচরণ করে থাকে।

মরুভূমি অঞ্চলের জীবনাচারের সাথে বন্যাতাড়িত অঞ্চলের মানুষের জীবনাচার এক হবে না, এটাই স্বাভাবিক। এর ফলেই এ দু'অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। তেমনি বিশ্বব্যাপী স্থানে স্থানে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক কেমন হতে পারে তা সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখতে হবে। ইসলাম কি স্থানীয় সংস্কৃতিকে অকার্যকর ঘোষণা দেয়, নাকি স্থানীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নেয়– এ প্রশ্নের সীমাংসা করতে হবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে সামনে রেখেই।

প্রথমত : ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। স্থানীয় সংস্কৃতির যে অংশটুকু এ মৌল বিশ্বাসের অনুকূল, ইসলাম সেটুকু তার নিজের সংস্কৃতির সাথে একীভূত করে নেয়।

দ্বিতীয়ত : যে অংশটুকু এ মৌল বিশ্বাসের অনুকূল নয় আবার প্রতিকূলও নয়, অর্থাৎ মৌল বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাকেও ইসলাম তার নিজের সংস্কৃতির মধ্যে স্থান দেয়।

---

[১] আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৪, পৃ. ৫৮-৬০।

[২] এখানে সংস্কৃতি অর্থে 'তমদ্দুন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

[৩] ডঃ হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ২৭-২৮; *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত : স্থানীয় সংস্কৃতির যে অংশটুকু ইসলামী মৌল বিশ্বাসের বিপরীত সে অংশটুকু ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাওহীদের পরিবর্তে যা শির্ককে উৎসাহিত করে, রিসালাতের ধারণাকে বিকৃত বা ভুলুণ্ঠিত করে এবং সর্বোপরি আখিরাতমূখী চেতনার পরিবর্তে ভোগবাদী চেতনার বিস্তার ঘটায়, ইসলামী সংস্কৃতি সেসব কাজকে অপসংস্কৃতি বিবেচনা করে। এ অপসংস্কৃতির চর্চা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[১]

(ঝ) ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষ এর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে। এ সীমার লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন সত্যের ধারক-বাহক।

আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল দর্শন হলো, এ জীবন কয়েকটি মৌল উপাদানের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর কোন লক্ষ্য-উদ্দ্যেশ্য নেই– নেই কোন পরিণতি। এসব মৌল উপাদানের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কিছুই নেই– আছে শুধু অন্ত হীন শূণ্যতা।

ইসলামী সংস্কৃতি মানব সমাজে এমন শৃংখলা গড়ে তোলে, যাতে ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ-সংস্থায় আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটতে পারে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে জীবন একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র, দুনিয়ায় এর কোন স্থায়ী মূল্যমান নেই– নেই প্রতিফল পাওয়ার কোন ব্যবস্থা।

ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তির মাঝে যোগ্যতা ও প্রতিভা জাগিয়ে দিয়ে পরিশুদ্ধ সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলাফল ভোগ করে সমগ্র মানব জাতি।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি- যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির স্বার্থ চরিতার্থ হয়, তা অপর ব্যক্তি বা জাতির জীবন ধ্বংস করেই হোক না কেন– তা-ই ন্যায়, সত্য, ভালো ও কল্যাণকর বিবেচিত হয়। আর যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির অসুবিধা বা স্বার্থহানি হয়, তা-ই অন্যায় ও পাপ।

ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার একত্ব ও মিল্লাতের ব্যাপকতর ঐক্য ও সম্মিলিত ভাবধারায় গড়ে ওঠে। এর ফলে মানব সমাজ থেকে যাবতীয় স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, জুল্‌ম-শোষণ ও হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভুত হয়ে যায় এবং পরস্পরের মাঝে আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে ব্যক্তি স্বার্থ ও সুখবাদী দর্শনের ভিত্তিতে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের ব্যক্তি ও জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, হিংসা, রক্তারক্তি ও কোন্দল অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই কারণে চারদিকে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি বিরাজমান থাকে– শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিতের বিভিন্ন শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

---

[১] আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৪, পৃ. ৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংস্কৃতিবান প্রতিটি ব্যক্তি অন্য মানুষের জন্যে বেঁচে থাকে। ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবন-জীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন আপনা থেকেই পূরণ হতে থাকে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিজিত জাতিগুলোকে প্রকৃতি-জয়ের সব তত্ত্ব, তথ্য ও গোপন রহস্য থেকে সম্পূর্ণ গাফিল বানিয়ে রাখে– বঞ্চিত রাখে সব প্রাকৃতিক কল্যাণ, সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে। এ সংস্কৃতি সব কিছুকে নিজেদের একচেটিয়া ভোগ-দখলে রেখে দেয় এবং বিজয়ী জাতির প্রাধান্য মানুষের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিতেই সচেষ্ট হয়।[১]

[১] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৩৯-২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

এক. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ

দুই. সংস্কৃতি চর্চায় বাংলাদেশী আলিমগণের চিন্তা ও মতের পার্থক্য

তিন. বাংলদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশে আশু করণীয়

(ক) পরিবার ভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা

(খ) মসজিদ ভিত্তিক সংস্কৃতির চর্চা

(গ) প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার

(ঘ) সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও সংগীতে

(ঙ) দা'ওয়াতী কাজে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহার

(চ) সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে গুরুত্বদান

(ছ) শিল্পীদের সহায়তা প্রদান

(জ) ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের পথে আগ্রাসন চিহ্নিত করণ

(ঝ) সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন ঠেকাতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

এক. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ

বাংলাদেশে[১] ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশ ও বিকাশ ঘটে আগত আরব বণিক, অভিযাত্রী, সূফী ও আলিমদের মাধ্যমে। প্রাক-ইসলাম যুগ থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে আসা-যাওয়া করতেন। আরব দেশের বণিকেরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, মসলা এবং সূতী কাপড় ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন।[২] মেঘনা তীরের চাঁদপুর নদীবন্দরে আরব বণিকগণ প্রধানত চন্দন কাঠের জন্য আসতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ আল-ইদরিসী লিখেছেন যে, বাগদাদ ও বসরা থেকে আরব বণিক এবং পর্যটকগণ মেঘনার মোহনার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করতেন। আরব ভূগোলবিদ আবুল কাসিম উবায়দুল্লাহ্ ইবনু খুরদাধবিহ (মৃ. ৯১২ খ্রী.) লিখেছেন, সন্দ্বীপের পর জাজিরাতুর-রামি নামক একটি ভূখন্ড আছে। এ তথ্য ইংগিত করে যে, জাজিরাতুর রামি নামে যেই ভূ-খন্ডের উল্লেখ করেছেন তা ছিল চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। কক্সবাজারের সমুদ্র সন্নিকটবর্তী আজকের রামু সেই রাজ্যেরই একটি ক্ষুদ্রাংশ।[৩] তৎকালে আরবদের বাণিজ্য পূর্ব চীন উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আর সপ্তম শতকে বঙ্গোপসাগর বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। কাজেই খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শুরুতেই আরব বণিকদের জাহাজ বাংলার উপকূলীয় বন্দরসমূহে নোঙ্গর করেছে।[৪]

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, ইসলামের প্রথম যুগেই আরব বণিকদের সাহায্যে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ইসলামের সত্য বাণী তথা ইসলামী সংস্কৃতি প্রবেশ করে। দক্ষিণ ভারতের মালাবারের অন্তর্গত চের দেশের রাজা চেরুমল পেরুমল নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই মালাবারে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রচারিত হয়েছিল।[৫] সুতরাং হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই (সপ্তম খ্রীস্টাব্দে) ভারতের পশ্চিম উপকূল

---

[১] বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচিতিতে জানা যায় যে, এ ভূখন্ডটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় শাসনের নানা ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাসও রয়েছে এ ভূখন্ডটির। এ উপমাহাদেশে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশনায়ই ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে সাহাবীগণ আগমন করেন। (ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ২৬)

[২] এ কে এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২০; বাংলাদেশে ইসলাম : কয়েকটি তথ্যসূত্র, মহীউদ্দীন খান, মাসিক মদীনা, জানুয়ারী, ১৯৯২, পৃ. ৪১।

[৩] *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

[৪] আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ৬৫।

[৫] রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে সাহাবী আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রাঃ) নবুয়তের সপ্তম সনে (৬১৭ খ্রী.) কায়েস ইবন হুযাইফা (রাঃ), উরওয়াহ ইবন আসাসা (রাঃ), আবূ কায়েস ইবন হারিস (রাঃ) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দুইটি জাহাজে করে চীনের পথে পাড়ি দেন। (ধারণা করা হয়) তাদের প্রভাবে মালাবার রাজা চেরুমল পেরুমল ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে উক্ত রাজা কিছুদিন নবী (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকেন। সাহাবী আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব (রাঃ) দীর্ঘ নয় বছর সফরে ছিলেন। চীন যাবার পথে তাঁকে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতেও নোঙর করতে হয়েছে। আর তাঁর সাহচর্যে এসে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক মানুষ নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (এ কে এম নাজির আহমদ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২১)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে।[১] ভারত-বাংলার সাথে আরবদের বাণিজ্য যোগাযোগের ফলে নবী (সাঃ)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন[২] এবং উমাইয়া শাসনামালে ভারত ও সিন্ধু উপকূলে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয় ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।[৩]

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক মুসলিম অভিযাত্রীরা সিন্ধুর পথে হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রাঃ)-এর আমলে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকেই সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফতুহুল বুলদান' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতোপূর্বে 'উসমান ইব্ন আবুল সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীরা সাকাফী, হারিস ইব্ন মুররা আবদী প্রমুখ সেনাপতি বার বার সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে এর বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন। এমন কি ৪৪ হিজরীতে আমীর মু'আবীয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মুহাল্লাবের পর 'আবদুল্লাহ্ ইবন সাওয়ার, রাশিদ ইব্ন আমর জাদীদী, সিনান ইব্ন সালামাহ, আব্বাস ইব্ন যিয়াদ ও মুনযির ইবন জারুদ আবদী বার বার হিন্দুস্তান সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।[৪] এসব অভিযানে মুসলমানরা কখনো সাফল্য আবার কখনো ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়।[৫] বিজিত অঞ্চলে তাঁরা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটান।

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে (৭১২ সাল) মোতাবেক ৯৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সাকাফী ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হবার পর মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমকে সেনাপতি করে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ

---

[১] *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

[২] হযরত 'উমরের খিলাফত আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অভিযানে যে সব সাহাবী আগমন করেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন : (১) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ বিন ইতবান (রাঃ), (২) আসেম ইবন আমর তামিমী (রাঃ), (৩) সুহার ইবনুল আবদী (রাঃ), (৪) সুহায়ল ইব্ন আদী (রাঃ) এবং (৫) হাকাম ইব্ন আবিল আস-সাকাফী (রাঃ)। (ড. মুহাম্মাদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ১২-১৩)

অন্যত্র রয়েছে : হযরত 'উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কয়েকজন মুসলিম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। হযরত মাহমুদ (রাঃ) ও হযরত মুহায়মিন (রাঃ) ছিলেন এঁদের দলনেতা। সাহাবীদের একের পর এক ৫টি দল বাংলাদেশে আসেন। (এ কে এম মহি উদ্দিন, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইফাবা, ১৯৯৬, পৃ. ৩১; ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬)

হযরত 'উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে যে সব সাহাবী উপমহাদেশে আগমন করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন হলেন : (১) উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা'মার তামীমী, (২) আবদুর রহমান ইবন সামুরা। (ড. মুহাম্মাদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ১৪-১৬)

[৩] *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

[৪] আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে (৬৬১-৬৭৩ খ্রী.) ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন সিনান ইবন সালামা আল-হুযালী (রাঃ)। এছাড়া ভারতে আগমনকারী অন্যতম তাবেঈ ছিলেন মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা (৬২৯-৭০২ খ্রী.)। (ড. মুহাম্মাদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৯)

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের লালমনির হাট জেলার সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে হিজরী ৬৯ সনে নির্মিত একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ইটগুলোতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ্ লিখাসহ ৬৯ হিজরী সনের কথা উল্লেখ রয়েছে। (ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮)

[৫] *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[১] মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম সমগ্র সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত জয় করেন। অঞ্চলটি ইসলামী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। মুজাহিদদের একটি দল সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটান।[২] অবশ্য মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমের অভিযানের পূর্ব থেকেই স্থলপথে ভারতে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম যখন পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সাওয়ান্দার অধিবাসীরা তার সাথে মিলিত হয়। সাওয়ান্দার অধিবাসী সবাই তখন মুসলমান ছিল। মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর এ আগমন দ্রুততর হয় এবং খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যেই সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের বসতি গড়ে ওঠে। এ সময় ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত পশ্চিম ভারতের বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা শুরু করে।

খ্রীস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে (৭৭৭--৮১০) বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল সিন্ধুনদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করেন। তিনি তৎকালীন ভারতের রাজধানী হিসেবে বিবেচিত কান্যকুব্জে বিরাট রাজ্যাভিষেক দরবার করেন। তার এ রাজ্যাভিষেক দরবারে ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি দেশের রাজাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ রাজ্যগুলোর মধ্যে যবন রাজ্যটি সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোন মুসলমান অধিকৃত রাজ্য বলে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন। সুতরাং অষ্টম শতকের শেষের দিকে এবং নবম শতকের গোড়ার দিকে সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের সাথে বঙ্গরাজ তথা বাংলার যোগাযোগ ছিল।[৩]

খ্রীস্টীয় দশম শতকে (৯৯৭ সালে) সুলতান মাহমুদ গজনভী লাহোর দখল করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ভারত দখল করতে আরো তিনশো বছর লেগে যায়। কিন্তু মুসলিম মুজাহিদগণের রাজ্য জয়ের জন্য ইসলামের দা'ওয়াত ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ থেমে থাকেনি। সাহাবী তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের পর আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন ও সূফী আলিমগণ এ পাক-ভারত-বাংলায় আল্লাহ্র দ্বীন ও ইসলামী সংস্কৃতি প্রচার করেন।[৪] সুতরাং খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে বাংলায় ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার অব্যাহত থাকে।

আরব, ইয়ামান, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে সূফী ও আলিমগণ বাংলাদেশে এসে ইসলাম প্রচারের এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন।[৫] একাদশ,

---

[১] *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৮৯।

[২] মুহাম্মদ ইবন কাসিমের ৫০ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক ছাড়াও এ সময় বহু সংখ্যক আরবীয় মুসলিম অধিবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সিন্ধু এলাকায় আগমন করেন। (ড..মোঃ আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব, প্রাগুক্ত, ২০০৪, পৃ. ৮৯)

[৩] *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩; *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[৪] *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

[৫] এসব সূফী ও আলিমগণের সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের সংখ্যা শতের সীমা পেরিয়ে যে হাজারে পৌঁছেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এঁদের মধ্য হতে মাত্র কয়েক জনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। অনেকের কেবলমাত্র নামটুকুই জানা যায়। আবার অনেকের নামটুকু জানাও সম্ভবপর হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে এসব সূফী ও আলিমগণের ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার পরবর্তীকালে এদেশে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় সহযোগী শক্তির কাজ করেছিল।[১]

১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন তুর্কী মুসলিম ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খালজী। বাংলাদেশের সর্বশেষ মুসলিম শাসক ছিলেন সিরাজুদ্দৌলাহ খান। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৩ শে জুন পলাশীর প্রান্তরে তাঁর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫৫৪ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। মুসলিম শাসকগণ এ দেশে ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে না এলেও তাঁদের শাসনামলে ইসলামের মুবাল্লিগদের আগমন পথ প্রশস্ত হয়।[২] শত শত মুবাল্লিগ এ দেশে আগমন করেন এবং তাঁরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কাছে ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার করেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে বহু মানুষ ইসলাম কবুল করে। মুসলিম শাসকগণ ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে এ দেশে অসংখ্য মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, মুসলিম শাসনের শেষের দিকে দেশ ও জাতির যাঁরা ছিলেন কর্ণধার তাঁরা চরম হিংসা-বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হন। সময় প্রবাহের এক অধ্যায়ে এসে নেতৃস্থানীয় একদল অপরিণামদর্শী মুসলিম ও একদল অর্থলিপ্সু অমুসলিম ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলে বাঙালাহ-বিহার-উড়িশায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানোর নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশী প্রান্তরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিজয় লাভের পরিণতিতে এ দেশের জনগণকে পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হতে হয়। ফলে এ দেশের গণমানুষকে ১৯০ বছর ইংরেজদের গোলামী করতে হয়।[৩]

কিন্তু ইংরেজদের দু'শ বছরের শাসন ও দমন-পীড়ন ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ধারাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। একেবারে শেষ করে দিতে পারেনি মুসলমানদের অর্জিত গৌরবকে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উনিশ শতকে এদেশের আলিম ও মাশায়িখগণ ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে যেমনি সোচ্চার ছিলেন, তেমনি বিশ শতকেও একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।[৪]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে এই উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং সৃষ্টি হয় পাকিস্তান (পূর্ব-পশ্চিম) নামে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র। অতঃপর ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তথা বাংলাদেশ নামে পরিচিতি

---

[১] একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে চট্টগ্রাম জেলা, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও, পাবনা জেলার শাহজাদপুর, বগুড়া জেলার মহাস্থান, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া ও দেওকোট এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। এ সময় যেসব সূফী ও মুজাহিদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন তন্মধ্যে প্রধান কয়েকজন হলেন : শাহ সুলতান বলখী, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, বাবা আদম শহীদ, মখদুম শাহদৌলা শহীদ, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী, শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকন, শাহ মাখদুম রূপোশ ও শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ। (আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৭৭)

[২] ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের পর ইসলাম প্রচারের ধারা খুব দ্রুত এগিয়ে চলে। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। পঞ্চদশ শতকে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এবং কতিপয় মুসলিম সুলতানের এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার কারণে ইসলাম প্রচারের গতি কিছুটা কমে এলেও সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। (আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৫-৭৭)

[৩] *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৪।

[৪] *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। খ্রীস্টীয় উনিশ ও বিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে (ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ) ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার এতোটাই বিস্তৃতি লাভ করে যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রায় ১৬ কোটি জনগণের মধ্যে ৯০% জনগণ মুসলিম। এ দেশে স্থাপিত হয়েছে তিন লক্ষাধিক মসজিদ, অসংখ্য মক্তব-মাদরাসা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী ব্যাংকসহ অসংখ্য রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। এ সব প্রতিষ্ঠান ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দুই. সংস্কৃতি চর্চায় বাংলাদেশী আলিমগণের চিন্তা ও মতের পার্থক্য

ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা-ধারার আলোকে এদেশে বহু সম্প্রদায় ও পন্থার আলিম রয়েছেন। তাঁরা নিজ নিজ চিন্তার আলোকে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করেছেন এবং করছেন।

উল্লেখ্য, উমাইয়া যুগের শেষের দিকে হানাফী মাযহাব এবং আব্বাসীয় যুগে শাফে'য়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের আলিমগণের একদল উক্ত মাযহাবপন্থী। অন্যদিকে একক কোন মাযহাবের অনুসরণ না করে পূর্বসুরীদের অনুসৃত নীতির আলোকে পথ অনুসরণের আরেকটি দল এদেশে রয়েছে। যারা আরব দেশে সালাফী এবং এদেশে আহলে হাদীস নামে পরিচিত। আহলে হাদীসগণ আল্লাহ্‌র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে কঠোর এবং শির্‌ক ও বিদ'আতের ঘোর বিরোধী। এঁরা সরাই সুন্নী জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।

এদেশে রয়েছে শী'আ সম্প্রদায়। এছাড়া রয়েছে বহু মারিফত ও তরিকতপন্থী। যথা- ফারায়িযী, অজূদিয়া, মাইজভান্ডারী, মাদারী, শাত্তারী, চিশতিয়া, নকশেবন্দীয়া, কাদরিয়া ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে পীর-মুরীদী কেন্দ্রীক বহু দল। যথা- জৌনপুরী, ফুরফুরী, কোটালী ইত্যাদি। তদুপরী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক স্বতন্ত্র চিন্তাধারার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে দেওবন্দী, ব্রেলভী, রামপুরী, আলিয়াপন্থী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দল রয়েছে। তাদের মতাদর্শের মধ্যে কম-বেশী মতপার্থক্য দেখা যায়। বাংলাদেশে দেশীয় ও বহিরাগত সূফীদের দ্বারা ইসলামের আগমন ঘটেছে। এসব সূফীদের প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন মতার্দশ ও আচার-অনুষ্ঠান। তাঁদের মাধ্যমে এদেশে সূফী মতাদর্শের বিস্তার ঘটে।

সুতরাং বাংলাদেশে বিভিন্ন মতের 'ওলামা রয়েছেন। এদের কেউ কেউ সংস্কারপন্থী ও বিদ'আত বিরোধী, কেউ কেউ কট্টরপন্থী এবং কেউ কেউ উদারপন্থী। আবার কেউ তাকলীদপন্থী এবং কেউ তাকলীদ বিরোধী। কেউ সূফীপন্থী, কেউ আবার এখানকার প্রচলিত সূফীবিরোধী। এদেশের কতিপয় আলিম রসমী মিলাদখানী এবং কিয়াসের অনুসারী, আবার কেউ কেউ এর বিরোধী। কতক আলিম ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করে বিনিময় গ্রহণের পক্ষপাতী; আবার কেউ এর বিরোধী। কতক আলিম রাজনীতিকে ধর্মের অঙ্গ মনে করেন। আবার কেউ তা মনে করেন না।[১] উক্ত মত ও পক্ষের আলিমগণ নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে সংস্কৃতি চর্চা করে চলেছেন।

---

[১] ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ.৩১-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশে আশু করণীয়

(ক) পরিবার ভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা

পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের প্রাথমিক ইউনিট ও প্রধান লালন ক্ষেত্র। ইসলাম পরিবারকে সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র পরিণত করে যে অতুলনীয় বিশ্ব ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছে তার তুলনা অদ্বিতীয়। সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা, শিষ্টাচার, স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধাবোধ সমন্বিত সুষম জীবনধারার প্রচলন ও বিকাশ এবং কল্যাণকর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার জন্য এই পরিবার পদ্ধতি সব সময়ই অতিশয় কার্যকরী প্রমাণিত। সুতরাং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চার বিকাশে এ পদ্ধতি অনন্য ভূমিকা রাখে।[১]

(খ) মসজিদ ভিত্তিক সংস্কৃতির চর্চা

মসজিদ হলো ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। মসজিদ ইসলামী সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প চর্চার যেমন প্রাণকেন্দ্র তেমনি মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থারও কেন্দ্র।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা যে অভিন্ন সাংস্কৃতিক বোধে উজ্জীবিত হয় সে বোধের দ্বারাই তারা পরিচালিত হয়। কাজেই আমাদের মসজিদগুলোকে ব্যবহার করতে হবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প চর্চার কেন্দ্ররূপে। মসজিদে নিম্নরূপ কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে :

১। প্রত্যেহ নির্ধারিত কোন ফরয সলাতের পর ১০/১৫ মিনিট কুর'আন ও হাদীসের আলোচনা করা;

২। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে ইসলামের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা;

৩। বিভিন্ন দিবসে আযান, ক্বিরাআত ও হামদ্-নাত এর মাহফিল বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে;

৪। প্রতিটি মসজিদে পাঠাগার চালু করা, সারাদিন বা কিছু সময় এসব পাঠাগারের বই মসজিদে বা মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করা;

৫। শিশু ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কুর'আন-হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা করা; এবং

৬। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মাহফিলের সময় ইসলামী সাহিত্য বা শিল্পকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

এভাবে স্বল্প শ্রম ও অল্প খরচে মসজিদকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা যেতে পারে।[২]

(গ) প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার

আধুনিক বিশ্বে রেডিও, টিভি ও ইন্টারনেট খুবই শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। তাই এ মিডিয়াগুলোকে ইসলামী সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী নাটক, ছবি, ইত্যাদি প্রচার করা যেতে পারে। পাশাপাশি ইসলামী বিরোধী বিষয়ের

---

[১] *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.. ৭১।

[২] *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদ জানিয়ে ইসলামের সঠিক দিক-নির্দেশনা তুলে ধরা যাবে। যারা ইসলাম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন তাদেরকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হলে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটতে পারে। আর এ মিডিয়া হতে পারে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।[১]

(ঘ) সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও সংগীতে

আধুনিক বিশ্বে মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোধ সৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যে মাধ্যমটি তার নাম সাহিত্য। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও ছড়া এসব নানা আঙ্গিকে সাহিত্য চর্চা চলে। শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সাহিত্যের কোন না কোন দিকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং সাহিত্য চর্চা করবেন এটাই স্বাভাবিক। এভাবে চর্চার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারাই তার জীবনবোধ গড়ে ওঠে। তাই ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হলে ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এজন্য ইসলামী সমাজ নির্মাণে আগ্রহী সকলকে ইসলামী সাহিত্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সার্বক্ষণিক সচেষ্ট থাকতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে বই সংগ্রহ, বই উপহার প্রদান, বই ক্রয়ে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা, সহায়তা করা, স্কুল-কলেজ-মসজিদে পাঠাগারের ব্যবস্থা করা ও তাতে নিয়মিত বই-পত্রের ব্যবস্থা করা, কুর'আন হাদীসের পাশাপাশি সৃজনশীল ইসলামী সাহিত্য দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী সাহিত্য চর্চার আগ্রহ সৃষ্টি করা, গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা চালু করা, সৃজনশীল ইসলামী সাহিত্য সংগ্রহ সপ্তাহ পালন করা, এ ধরনের নানাবিধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংস্কৃতি বিকাশের পথকে আরো সুগম করা যেতে পারে।

নাটকও একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম। মঞ্চ নাটক ছাড়াও মিডিয়া ভিত্তিক টিভির নাটক এদেশে খুব জনপ্রিয়। তাই নাটকের মাধ্যমেও এদেশে ইসলামী সংস্কৃতি জনপ্রিয় করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কিছু সীমাবদ্ধতার শিকার হতে হয়। এতে পর্দা মেনে চলা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে ওলামা মাশায়িখ ও নাট্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড করে তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

এ দেশের যারা সিনেমা হলে ভীড় জমান তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ। এদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমটি অধিক ফলপ্রসূ। তাই কোন প্রতিষ্ঠানকে ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে ছবি নির্মাণের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে। যারা বানিজ্যিক ছবি নির্মাণ করছেন তাদেরকে ইসলামের ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছবি নির্মাণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

মানুষের মাঝে সাংস্কৃতিক বোধ জাগাতে সংগীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। হামদ-নাত ও ইসলামী সঙ্গীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং অডিও-ভিডিও ক্যাসেট এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। তাই যারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের কাজে নিয়োজিত ইসলামী সংগীত প্রসারেও তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।[২]

---

[১] *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

[২] *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) দা'ওয়াতী কাজে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহার

বর্তমান সময়ে প্রচার মাধ্যম যার দখলে পৃথিবীর কর্তৃত্ব মূলত তারই হাতে নিবদ্ধ। প্রচার মিডিয়ার প্রতিটি দিক সংস্কৃতি প্রচারের এক একটি বিশাল হাতিয়ার। সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে ইসলামের প্রভাব বিস্তার ঘটানোর আর কোন বিকল্প হাতিয়ার নেই। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়নের সকল দিকগুলো সংস্কৃতি নির্ভর হয়ে বিশ্বব্যাপী যে ব্যাপক মানসিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তার মোকাবিলা করা একমাত্র সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব। কুর'আন হিকমাত ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে দ্বীন প্রচারের যে আদেশ করেছে তার অনিবার্য দাবীই হচ্ছে যুগের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিতে ইসলামের প্রচার করা। প্রাচীন প্রযুক্তি অকার্যকর বিবেচিত হলে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে দ্বীন প্রচারের কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত। গোঁড়ামী বা কুপমন্ডুকতার কারণে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। তলোয়ারের মোকাবেলা করতে হয় তলোয়ার দিয়ে, জবানের মোকাবেলায় ব্যবহার করতে হয় সমৃদ্ধ জবান। অস্ত্র দিয়ে মনস্তাত্তিক হামলার মোকাবেলা করা যায় না। প্রতিটি হামলার অস্ত্র যেমন ভিন্ন তেমনি ভিন্নতর অস্ত্র দিয়েই তার মোকাবেলা করতে হয়।

যেহেতু এখন অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপর্যুপরি আঘাত হানা হচ্ছে সংস্কৃতির উপর, মুসলিমদের ঈমান ও আমল বিনষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক হামলা, তাই এর মোকাবেলায় শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। মুসলিমদের ঈমান আমল সংরক্ষণ এবং অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যই এই মুহূর্তে সর্বাগ্রে সাংস্কৃতিক তৎপরতায় নিজেকে জড়িত করে নেয়া ইসলাম প্রচারকদের জন্য অপরিহার্য।[১]

(চ) সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে গুরুত্বদান

ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন- কিন্তু কার্যত এ চর্চার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠে না। কর্মের ময়দানে নিরব অনুভূতির কোন দাম নেই- অনুভূতির বাস্তব বহিঃপ্রকাশই সেখানে মূখ্য বিষয়। এ জন্য ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে যে কাজটির প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া দরকার তা হলো সকল প্রকার ইসলামী প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থায় "সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার" জন্য কার্যকরী স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রাখা। এসব প্রতিষ্ঠান যদি জাতীয় ভিত্তিক হয় তবে তার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে এ বিভাগকে সক্রিয় রাখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে অসংখ্য ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা সব সময় ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের জন্য তৎপর। এসব তৎপরতার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা জরুরী। এ জন্য দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশক। এক, সম্ভাব্য সকল ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন কায়িম করে তার মাধ্যমে পরস্পরের

---

[১] *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

কাজের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা। দুই, একটি জাতীয় ভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কায়িম করে সারা দেশে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেয়া এবং তার মাধ্যমে তৎপরতা চালানো।[১]

(ছ) শিল্পীদের সহায়তা প্রদান

শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে এদেরই সঠিক দিক-নির্দেশনার উপর। এঁরা মানুষকে দেয় আশা, প্রেরণা যোগায় যে কোন কঠিন মুহূর্তে। নিবেদিত প্রাণ এসব শিল্পীরা সাধারণভাবে হয় নির্লোভ ও অবহেলিত। বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনার মোকাবেলা করতে হয় তাঁদের। সমাজের বঞ্চনা, গৃহের গঞ্জনা, মানুষের অবজ্ঞা, অবহেলা ও তিরস্কার সহ নানাবিধ জটিলতার মধ্য দিয়েও এঁরা সামাজের জন্য তাঁদের সৃষ্টিকে উপহার দিয়ে যায় কেবলমাত্র প্রাণের তাগিদে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা সমাজদেহের চক্ষু, সভ্যতার বাগান। সমাজ পরিচালকরা সে বাগানের মালি। তারা যত বেশী এ বাগানের পরিচর্যা করবে সমাজে তত বেশী হৃদয়ের পুষ্প ফুটবে। যে জনগোষ্ঠি এ বাগানের পরিচর্যায় অমনোযোগী হবে তাঁরা বঞ্চিত হবে মানবতার পুষ্প সৌরভ হতে।

ফুল যেমন নিজের সৌরভ ও সৌন্দর্য বিলিয়ে আনন্দ পায়, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিরাও তেমনি আপনার সৃষ্টি জগদ্বাসীকে দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু এ দেয়াটা নির্ভর করে নেয়ার উপর। যারা তাঁদের কাছে চাইবে এবং যেমনটি চাইবে তাঁরা তেমনটিই উপহার দিবে। সে জন্য একটি কল্যাণময় ইসলামী সমাজ যাদের কাম্য, তাদের উচিত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান করা। এ পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা যত বেশী দিতে পারবে ততই ইসলামী সমাজের অনুকূলে তাদের সৃষ্টি বৈচিত্রের বিকাশ ঘটবে। সুতরাং শিল্পীদের সার্বিক সহায়তা দানের জন্য সুস্পষ্ট ও সুষম পরিকল্পনা দরকার। তবেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব হবে।[২]

(জ) ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের পথে আগ্রাসন চিহ্নিত করণ

মুসলিম সংস্কৃতি বাংলাদেশের এই ভৌগলিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। মুসলিম সংস্কৃতির মূল এখানকার সমাজ ব্যবস্থার সুগভীরে প্রোথিত এবং এ সংস্কৃতি এ দেশের জন সমাজে শত শত বছর থেকে লালিত। তবে বর্তমানে এদেশে মুসলিম সংস্কৃতি বহু আগ্রাসনের শিকার। তাই সেগুলো থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

আগ্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আক্বীদা, চরিত্র ও নৈতিকতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। সমাজে অশ্লীলতা, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। বিকৃতিকে সুকৃতির আবরণ দিয়ে মাতিয়ে তোলা হচ্ছে। অশ্লীলতা, পংকিলতা, নীতিহীনতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। পারিবারিক ঐতিহ্য ধ্বংস করা হচ্ছে। পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটানো হচ্ছে। মূলত এইসব হচ্ছে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকার সুযোগে।

যেসব মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, সেগুলো হলো :

১। আদর্শহীন শিক্ষা ব্যবস্থা;

২। নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল বই-পুস্তক ও পত্রপত্রিকা;

৩। টেলিভিশনে নগ্ন অপসংস্কৃতির প্রচার;

---

[১] *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

[২] *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪। বিদেশী ইসলাম বিদ্বেষী ও বস্তুবাদী দর্শনের বাহক বই-পুস্তক ও পত্রপত্রিকার অবাধ আমদানি;

৫। আদর্শ বিবর্জিত সিনেমা, নাটক, গান, যাত্রা ইত্যাদি;

৬। সহশিক্ষা;

৭। নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল অডিও-ভিডিও;

৮। সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এবং ব্যক্তি ও জাতিপূজা;

৯। আদর্শহীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অনাচার;

১০। N.G.O -দের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা;

১১। নারী ও শিশু শ্রম;

১২। পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি।[১]

(ঝ) সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন ঠেকাতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ

ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, তা হলো :

১। আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২। আদর্শের ভিত্তিতে আরো ব্যাপকভাবে শিল্প ও সাহিত্য সংস্থা গড়ে তুলতে হবে;

৩। ইসলামী জীবন দর্শনকে প্রতিফলিত করে এমন বই-পুস্তক রচনা, প্রকাশনা ও বাজারজাত করার ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে। জেলায় জেলায় ইসলামী বই মেলার ব্যবস্থা করতে হবে;

৪। ইসলামী চেতনাধারী পত্রপত্রিকার প্রকাশনা প্রচুর বৃদ্ধি করতে হবে;

৫। ইসলামী জীবনবোধকে প্রতিফলিত করে ব্যাপক ভিডিও-অডিও তৈরি করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া দরকার;

৬। রেডিও-টেলিভিশনে ইসলামী সংস্কৃতির বাহক প্যাকেজ প্রোগ্রাম করতে হবে;

৭। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন জোরদার করতে হবে। ব্যাপক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে;

৮। অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী বই-পুস্তক, পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও আমদানি বন্ধ করতে হবে;

৯। রেডিও-টেলিভিশনে অপসংস্কৃতির প্রচার বন্ধ করতে হবে;

১০। যাবতীয় নেশা ও নেশা ভিত্তিক আড্ডাখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে;

১১। অপসংস্কৃতির ধারক বাহক এন. জি.ও. দের অপকর্মের প্রতিবাদ করতে হবে;

১২। ইসলাম বিরোধী মিশনারিদের তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে;

১৩। সুদ, জুয়া, জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে; এবং

১৪। আদর্শহীন রাজনীতির চর্চা পরিহার করতে হবে।

এগুলো করতে হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। মানুষের মাঝে তীব্র আদর্শবাদী চেতনাবোধ সৃষ্টি করে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নির্মূল করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে মাওলানা আবদুর রহীম অত্যন্ত সুন্দর কথাই বলেছেন :

---

[১] *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

"আমাদের সংস্কৃতিকে বিজাতীয় ও আদর্শ বিরোধী উপাদান ও ভাবধারামুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শবাদীদের সংগ্রাম চালাতে হবে। এ সংগ্রাম কঠিন ক্লান্তিকর। এ পথে পদে পদে বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু পূর্ণ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে এ সংগ্রাম চালাতে পারলে এর জয় সুনিশ্চিত। বর্তমান বিশ্ব এমনি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবতাবাদী ও সকল মানুষের জন্যে কল্যাণকর এক সংস্কৃতির প্রতিক্ষায় উদগ্রীব।"[১] (জাহানে নও : শিক্ষা ও আদর্শ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৯)

[১] *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

[তৃতীয় অধ্যায়]

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশী ওলামার অবদান (১৯৭১-২০০৯)

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
মাওলানা আবদুল আলী
মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হুদা পাঁচবাগী
মাওলানা মনযুরুল হক
মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর
মুফতী-এ-আজম মাওলানা ফয়েজুল্লাহ
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
মাওলানা আতহার আলী
মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ
মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী
মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী
মাওলানা আবদুল মজিদ খাঁ
খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহ্‌মদ
মাওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান
মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী
মাওলানা মুনীর আহমদ সিদ্দীকী
মাওলানা আলী আকবর
মাওলানা লুৎফর রহমান
মাওলানা আব্বাস আলী খান
অধ্যাপক গোলাম আযম
মাওলানা দেয়াওয়ার হোসাইন সাঈদী
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
আল্লামা আযীযুল রহমান নেছারাবাদী
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক
মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম
মুফতী ফজলুল হক আমিনী
প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহমান
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
ডক্টর সিরাজুল হক
ডক্টর আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী
ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
ডক্টর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

[১৮৮০-১৯৭৬]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ শহরের ধানগড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা হাজী শরাফত আলী খান। কিশোর আবদুল হামিদ খান কিছুদিন ধানগড়া প্রাইমারি স্কুলে পড়ালেখা করেন। অতঃপর তাঁর চাচা হাজী ইব্রাহীম তাঁকে সিরাজগঞ্জ মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন।[২] এখানে কিছুদিন পড়ালেখার পর তিনি মাদরাসা ছেড়ে দেন এবং শ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৩] পরে সিরাজগঞ্জ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আবদুল বাকী আবদুল হামিদ খানকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেওবন্দ মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন।[৪] তিনি সেখানে দুই বছর অধ্যয়ন করেন।[৫]

শিক্ষকতা

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে কিছুদিন টাংগাইলের কাগমারী প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাদদেশে হালুয়াঘাটের নিকটস্থ কল্লা নামক গ্রামে সূফী সাধক শাহ আবদুন-নাসের আলী বাগদাদী প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।[৬]

সংগ্রামী জীবন

মাওলানা ভাসানী ১৯১৯ সাল থেকে উপমহাদেশের খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এ সময় তিনি মাওলানা আযাদ সুবহানী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মোহন চাঁদ, করমচাঁদ গান্ধী, দেশবন্ধু সি.আর.দাশ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯১৯ সালে আসামের জোড়হাটে[৭] ১০ মাস কারাদন্ড ভোগ করেন।[৮]

মাওলানা ভাসানী ১৯২১-২২ সালে দেশবন্ধু সি.আর.দাশের উত্তরবংগ সফরকালে সফরসঙ্গী হয়ে তাঁর সেবা করেছেন। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তরবংগে বন্যা ও মহামারী কবলিত

---

[১] হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদক), *মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১।

[৪] আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৬১।

[৫] মতান্তরে তিনি সেখানে অল্পদিন অধ্যয়ন করে দেশে ফেরেন। (আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১)

[৬] *মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১-৭২।

[৭] ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৩১।

[৮] আবদুল হক ফরিদী, আ. ফ. ম. (সম্পাদক), *ইসলামী বিশ্বকোষ* ১খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৫৩৯; শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক), *মাওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৮, পৃ. ১৫২, আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় ত্রাণকাজে মাওলানা ভাসানীর পরিশ্রমে মুগ্ধ হয়ে দেশবন্ধু তাঁকে ময়মনসিংহের ত্রাণ শিবিরের 'উপ-নেতা' নিযুক্ত করেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করলে মাওলানা ভাসানী উত্তর বাংলার গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের পক্ষে কাজ করেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা ভাসানী সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেন।[১]

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আসামের ধুবড়ী জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে বহিরাগত বাংগালীদের নিয়ে এক বিশাল সম্মেলন করেন। ঐ সম্মেলনের সাফল্য দেখে লোকজন তাঁকে 'ভাসানীর মাওলানা' উপাধি দেন। ফলে পরবর্তীতে তিনি 'মাওলানা ভাসানী' নামে পরিচিতি পান।[২]

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা ভাসানী আসামে সর্বপ্রথম কৃষক-প্রজা আন্দোলন করে কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।[৩]

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা ভাসানী আসামের ঘাগমারীতে জংগল পরিষ্কার করে সেখানে স্থায়ী আবাসিক এলাকা গড়ে তোলেন। যা পরবর্তীতে 'হামিদাবাদ' নামে পরিচিতি পায়। তিনি সেখানে স্কুল-মাদরাসা স্থাপন করেন।[৪]

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা ভাসানী পুনরায় আসামের ভাসান চরে এক ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৫]

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা ভাসানী কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন।[৬]

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে টাংগাইল মহকুমা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হলে মাওলানা ভাসানী সেখানে খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা কবলিত মানুষদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে মাওলানা ভাসানী উপদ্রুত এলাকায় যান। পরে বন্যার পানি সরে গেলে নওগাঁয় এক বিশাল কৃষক সম্মেলন করেন। সেখানে ঋণ মওকুফের দাবিতে সাধারণকে জমিদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কারণে তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিস্কার করা হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি আসামে বসবাস করেন।[৭] আসামে ১৩ বছরের প্রবাসী জীবনে তিনি ৯বার জেল খেটেছেন, আবার কখনো গ্রেফতারের ভয়ে পাহাড়ের গুহায় ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন।[৮]

---

[১] আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৭-৬৮।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

[৩] *মাওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

[৫] আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৮৫।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

[৭] আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৮৮।

[৮] আরেফিন বাদল (সম্পাদক), *মওলানা ভাসানী*, হারুন আরেফিন, যোগীনগর, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।[১] আসামের রাজনৈতিক সংগ্রামে মাওলানার সাফল্য অনন্য সাধারণ। আসাম প্রাদেশিক পরিষদে প্রবাসী বাংগালীদের ৯টি আসনে তিনি বিজয় লাভ করেন। বাংগালী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১১ বছর আইন সভার সদস্য ছিলেন।[২]

১৯৩৮ সালে মাওলানা ভাসানী আসাম থেকে গাইবান্ধায় এসে এক কৃষক সমাবেশ করেন।[৩]

১৯৪০ সালে মাওলানা ভাসানী এ.কে ফজলুল হকের সাথে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে যোগদান করেন।[৪]

ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত সিলেটের গণভোটে মাওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দেন।[৫] ১৯৪৭ সালের ৩ ও ৪ মার্চ পর পর বেংগল-আসাম মুজাহিদ সম্মেলন, ন্যাশনাল গার্ডস সম্মেলন, নওজোয়ান সম্মেলন ও লিটারারি কনফারেন্সের আয়োজন করেন এবং পুনরায় জেল খাটেন।[৬]

১১ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার আরমানীটোলা মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তানে এলে মাওলানা তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকাতে ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব দেন।

১৯৪৮ সালে ভারতীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মাওলানা ভাসানী তৎকালীন পূর্ব বাংলায় এসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৫০ সালে মাওলানা ভাসানী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট করেন।

১৯৫২ সালে তিনি ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কারাবরণ করেন।

১৯৫৪ সালে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বার্লিন যাত্রা করেন। তিনি ৫ মাস লন্ডনে অবস্থান এবং স্টকহল্‌মে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। একই সালে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় হয়। তৎকালীন গভর্নর ইস্কান্দার মীর্যা কর্তৃক ভাসানীকে দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ দেয়া হয়।

১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি মাওলানা ভাসানী কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন করেন। ২৭ জুলাই তিনি সীমান্ত গান্ধী গাফফার খান, আচকজাই, আবদুল মজিদ সিন্ধী, মিয়া ইফতেখারকে নিয়ে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠন করেন।

১৯৫৮ সালে তিনি মীর্জাপুর হাসপাতাল থেকে আইয়ুব সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের দাবিতে মাওলানা ভাসানী অনশন করেন।

---

[১] আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৮৮-৮৯।

[২] আরেফিন বাদল (সম্পাদক), *মওলানা ভাসানী*, হারুন আরেফিন, যোগীনগর, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৩।

[৩] আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৮৯।

[৪] *মাওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে মাওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। গণচীনের জাতীয় দিবসে যোগ দেন এবং এ সময় তিনি চেয়ারম্যান মাওসেতুং এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ-এর লাই-এর সাথে সাক্ষাত করেন।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির' গঠন করেন এবং ১৯ জানুয়ারি 'সার্বজনীন ভোটাধিকার দিবস' করার আহ্বান জানান। একই সালে জাপানের টোকিওতে বিশ্ব ধর্মীয় সম্মেলনে যোগ দেন এবং পুনরায় চীন সফরে যান।

১৯৬৫ সালে কিউবার রাজধানী হাভানায় আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৬৮ সালে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ঐতিহাসিক 'ঘেরাও' আন্দোলন প্রবর্তন করেন।

১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত সভায় শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে দেশে 'ফরাসী বিপ্লব' করার হুমকি দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করলে তাঁর সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। ৮ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেন। ৯ মার্চ মাওলানা ভাসানী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা ও চুক্তি করেন। ২৭ অক্টোবর 'ভোটের আগে ভাত চাই' শীর্ষক তাঁর পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেন। ২ অক্টোবর ঢাকাতে পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক সমাবেশ ও গণমিছিলে নেতৃত্ব দেন। প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ-এর দাবি উত্থাপন করেন। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু। তিনি তখন বলেছিলেন : স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান না দেখে আমার মৃত্যু নাই।

১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারি সন্তোষে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন' আহ্বান, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা ও দেশ ত্যাগ করেন।

১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং 'সাপ্তাহিক হক কথা' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯৭৩ সালের ১২ ডিসেম্বর সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান, ১৫ মে খাদ্যের দাবিতে অনশন এবং সেপ্টেম্বরে 'দৈনিক বংগবার্তা' প্রকাশ করেন।

১৯৭৪ সালে 'হুকুমতে রব্বানিয়া' সমিতি গঠন, ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান এবং খাদ্যের দাবিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন।

১৯৭৬ সালের মে মাসে ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবং ১৩ নভেম্বর খোদাই খিদমতগার সম্মেলনে ভাষণ দান করেন।

ইন্তেকাল

মাওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর বুধবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।[১]

মাওলানা ভাসানী কর্মজীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন কৃষক প্রজা ও দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং জমিদার-মহাজনদের শোষণের বিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন সমাজ ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে। ১৯৭০ সালে তিনি তাঁর এক লেখায় বলেন :

---

[১] *মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪-৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

"ছোটবেলা হইতেই আমার মনে দাগ কাটিয়াছিল সমাজের তথাকথিত খানদানীপনা। জমির পরিমাপে মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ করাটা আমি মোটেই বরদাশত করিতে পারিতাম না। জমিদার-মহাজনদের সুপরিকল্পিত শোষণের পরিচয় যেদিন পাইয়াছিলাম, সেইদিনই মনে চাহিয়াছিল, গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকে দুমড়াইয়া নতুন কিছুর পত্তন করি। তাই আসামের জলেশ্বরে জীবন শিক্ষার হাতেখড়ি সূফি সাধক শাহ নাসিরুদ্দীন বোগদাদীর নিকট পাইলেও যুগের আকর্ষণে যোগ দিয়াছি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে, কংগ্রেস আর মুসলিম লীগে। শিখিবার জন্য, নিজেকে চিন্তায় ও কর্মে বলিষ্ঠ করিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু মনে সংগ লইয়াছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, স্যার প্রফুল্লা চন্দ্র রায়, মাওলানা আযাদ সোবহানী এবং মাওলানা হোসেন আহমাদ মাদানীর ন্যায় ব্যক্তিবর্গের। ঘটনা প্রবাহ আর ব্যক্তিত্বের সংগ আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু আমি যাহা বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা হইল : গড়িতে হইলে আগে ভাংগিতে হয়। মানুষের মুক্তি আপোস-রফায় আসে না। সুদূর প্রসারী কর্মসূচীভিত্তিক বিপ্লবই এর একমাত্র পাথেয়।"[১]

মাওলানা ভাসানী ইসলামী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন : 'আমার সমাজতন্ত্র ইসলামী সমাজতন্ত্র।' তাঁর ভাষায় বলতে গেলে :

"পারিবারিক জীবনের অশুভ দিকও রহিয়াছে বটে। পরিবারের চাপেই মানুষ অতি বৈষয়িক হইয়া ওঠে এবং দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে, সমাজের কথা ভুলিয়া যায়, আত্মকেন্দ্রিক ও লোভী হইয়া পড়ে। এই জন্যেই গোটা সমাজটাকে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে গড়িয়া তোলা দরকার। তাহাতে কেহ লোভের বশবর্তী হইয়া বিপথগামী হইবে না।[২] মন চাহিয়াছে কোন এক অলৌকিক শক্তির বলে হইলেও সমাজটাকে ওলট পালট করিয়া দিই-মানুষের মুখে হাসি ফুটাই। আমার জীবনের বিনিময়ে যদি হাসি ফুটতো আমার জন্ম কতই না সার্থক হইত।"[৩]

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ইচ্ছা ছিল 'হুকুমত-এ-রব্বানী' অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। মাওলানা ভাসানী স্বয়ং 'হুকুমত-এ-রব্বানী'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

"সারা বিশ্বের সবকিছুকে স্রষ্টা যেমন লালন পালন করেন, তেমনি তিনি লালন পালন করেন সৃষ্টির অভিজাত মানুষকেও। মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে সৃষ্টির প্রতিভূ হিসাবে। তাই মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবন যাপনেও হইবে পালনবাদের অনুসারী। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্রষ্টার প্রতিভূ হিসেবে মানুষ পালনবাদের নীতিকে প্রবর্তন করিবে, শাসনবাদকে করিবে পরিহার। একটি পরিবারে পিতা যেমন সন্তান-সন্ততিদের অভাব-অনটন অনুযায়ী সবকিছুর ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণও রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন। সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে পিতা এবং সন্তানদের ভিতর প্রেম-প্রীতির যে মধুর সম্পর্ক বিরাজমান, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসা মানুষের জীবনকে ঘিরিয়া থাকবে। শাসন করিয়া অন্যকে আদেশ প্রতিপালন করানো যাইতে পারে, কিন্তু তার ফল খুব শুভ হয় না। আন্তরিকভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন কিছুকে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাহ্যিক চাপ শুধু সমস্যারই সৃষ্টি করে। শাসনবাদে যে কর্তৃত্বের অহমিকা রহিয়াছে, তাহা মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিতর ফাটল

---

[১] *মাওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাসিত শাসককে দেখে সন্দেহের চোখে, সুযোগ পাইলেই শাসনের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠে।"[১]

মাওলানা ভাসানী সুনাগরিক তৈরীর জন্য শিক্ষার উপর জোড় দিয়েছেন। তিনি উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের শাসন-শোষণ বিনা বাধায় পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কেরানি সৃষ্টির লক্ষ্যে এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল।[২]

মাওলানা ভাসানী শারীরিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। শরীর সুস্থ থাকলে মন সুস্থ থাকে। শরীর ও মন পরস্পর নির্ভরশীল। কেননা কর্মের জন্য সুস্থ শরীর অবশ্যই প্রয়োজন। তাই তাঁর শিক্ষা-চিন্তায় শরীর সুস্থ রাখার জন্য শারীরিক পরিশ্রম প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে।[৩]

মাওলানা ভাসানী কারিগরি শিক্ষাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন। তিনি তাঁর শিক্ষা-চিন্তায় কর্ম উপযোগী কারিগরি শিক্ষা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী মনে করতেন। যেমন, তিনি লিখেছেন :

"তাঁতের কাজ, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ, মাছের চাষ, রেশমের চাষ, পশুপালন, গাছ-গাছড়া ফল ও সর্বজির চাষ, রাজমিস্ত্রি ও সুতারমিস্ত্রির কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি যাবতীয় টেকনিক্যাল শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীরা লাভ করিবে এবং ইহাদের কমপক্ষে একটি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক থাকিবে। আর ইহাই হইবে পার্থিব ক্ষেত্রে তাহাদের সৎসাহস ও মনোবল রক্ষার চাবিকাঠি"।[৪]

মাওলানা ভাসানী ধর্ম শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সুনাগরিক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্মের বিশ্বাসীকে স্বীয় ধর্মের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মীতে রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন। যেমন, এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে তাহার ধর্মের মূল শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দান করা হইবে এবং তাহা আমল করা বাধ্যতামূলক থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমান ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে হইতে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন মনোনয়ন করা হইবে। এক সপ্তাহ পরপর নতুর করিয়া মনোনয়ন করিতে হইবে। ইমামকে জুমআর খুৎবায় চলতি সপ্তাহের বিশ্বসমীক্ষা আলোচনা করিতে হইবে। এই ভাবে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিস্টান হউক, বৌদ্ধ হউক প্রত্যেক ছাত্রীকে স্বীয় ধর্মের ধারায় শৃঙ্খলা, পবিত্রতা, চরিত্র গঠন এবং বিশ্বানুভূতির শিক্ষা দান করা হইবে। পবিত্র জীবন-যাপন ও চরিত্রবান হওয়ার প্রতি অবহেলা করিলে কোনো ছাত্রকেই ক্ষমা করা হইবে না"।[৫]

মাওলানা ভাসানী ছিলেন বিপ্লবী জননেতা, নিবেদিত রাজনীতিক, শিক্ষানুরাগী, বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও পত্র-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও হুকুমতে রব্বানী কায়েমের প্রবক্তা। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত মজলুম জনগণের কথা ভেবেছেন, বলেছেন, এজন্য আন্দোলন করেছেন, কারা-নির্যাতন ভোগ করেছেন, অনেকটা সাফল্যও অর্জন করেছেন। ক্ষমতার দণ্ড ও লোভকে তিনি পদাঘাত করেছেন। একজন ধর্মপ্রাণ আলিমের মর্যাদা বজায় রেখে তিনি নিঃস্বার্থ রাজনীতি করেছেন।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫।

[২] কাজী নূরুল ইসলাম, *উচ্চতর মানবিবদ্যা গবেষণাকেন্দ্র নিবন্ধনমালা*, চতুর্দশ খণ্ড, ২০০৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬২।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল আলী

(১৯০২-১৯৭৪)

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা আবদুল আলী ১৯০২ সালে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার অন্তর্গত বহুলাতলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পরবর্তী বাসস্থান ফরিদপুর। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন পিতা হাজী হাফেজ মুহম্মদ আবদুল হাকীমের নিকট। মাওলানা আবদুল আলী কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে 'ফখরুর মুহাদ্দিসীন' পরীক্ষা পাস করেন। অতঃপর দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজ থেকে ১৯৩৭ সালে 'ফাযিলুত তিব্বিল-জারাহাত' ডিপ্লোমা অর্জন করেন।[১]

রাজনীতি

১৯৪০ সালে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হলে মাওলানা আবদুল আলী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ফরিদপুর জেলা 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম'-এর সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।[২] আবদুল আলী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কাজ করেন।[৩] তিনি ১৯৫৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন।[৪] তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান 'ইত্তেহাদুল উলামা' সমিতিরও সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৫ সালে 'জামায়াত' নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫] তিনি ১৯৬২ সালে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সদস্য নির্বাচিত হন।[৬] ১৯৬৯-১৯৭০ সালে তিনি ফরিদপুরে আইয়ুব বিরোধী সর্বদলীয় গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালে ভীত-সন্ত্রস্ত জনগণকে তিনি সাহস প্রদান করেন।[৭]

সমাজসেবা

মাওলানা আবদুল আলীর প্রচেষ্টায় বহু স্কুল, মক্তব, মাদরাসা, ব্যায়ামাগার, ক্লাব ও রাস্তা নির্মাণ হয়। ফরিদপুরে এস্টেট অরফ্যানেজ ও বায়তুল আমান প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি বহু জনকল্যাণমূলক সমিতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ফরিদপুর 'খাদেমুল ইনসান' মিশনের সদস্য হিসেবে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। সভা-সমিতি ও অন্যান্য কর্মপন্থা অবলম্বন করে তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াস চালান।

---

[১] ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯৫, পৃ. ২১৭-২১৮; Md, Nuruzzaman, *Who's Who*, Dacca : The Eastern Publication, N.D. p. 233.

[২] *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮; *Who's Who*, Ibid, p.254.

[৩] *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮; *Who's Who*, Ibid, p.254.

[৪] *Who's Who*, Ibid, p.254.

[৫] জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৪১।

[৬] *Who's Who*, Ibid, p. 234.

[৭] *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ রচনা

মাওলানা আবদুল আলীর রচিত বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (১) ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (২) ইসলামী যিন্দিগী ও ইসলামী সমাজ।[১]

মৃত্যু

মাওলানা আবদুল আলী ১৯৭৪ সালে হজ্জ করতে গিয়ে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[২]

ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার-প্রসারকে এগিয়ে নিতে মাওলানা আবদুল আলী যে ভূমিকা রেখেছেন তা প্রশংসাযোগ্য। তাঁর সমাজসেবামুলক কাজ ও ইসলামী পুস্তক রচনা ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তাঁর এ অবদানের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

---

[১] *Who's Who,* Ibid, p. 233.

[২] *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

[১৯০০–১৯৮৬]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৯০০ সালের ২৭ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত তারুটিয়া (রশিদাবাদ) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শাহ সৈয়দ আবূ ইসহাক।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ছোটবেলায় মাদরাসায় কিছুদিন পড়ালেখা করে পরে বগুড়া জেলার শেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হন।[১] অতঃপর তিনি ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে দেওবন্দ দারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হয়ে এক বছর অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি ১৯২৪ সালে লাহোরের ইশাআতুল ইসলাম কলেজে ভর্তি হয়ে তিন বছর (১৯২৪–২৭ খ্রী.) অধ্যয়ন করেন।[২]

রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে ১৯২৭ সালে 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রচারকরূপে যোগ দেন।[৩] তিনি ১৯৩৩ সালে হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় 'বঞ্চিত রায়ত-খাতক' সমিতি গঠন করেন।[৪]

মাওলানা তর্কবাগীশ ১৯৩৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং মুসলিম লীগের প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[৫] ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে উল্লাপাড়া এলাকা থেকে বংগীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪৯ সালে তিনি পূর্বংগীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন, পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ প্রভৃতি প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও ইসলামের সাম্যনীতি প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন।[৬]

১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনে মাওলানা তর্কবাগীশ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।[৭]

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকায় মিছিল করলে পুলিশ মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করে। ফলে কয়েকজন ছাত্র শহীদ হন। সেদিন জগন্নাথ হলে পূর্ববংগের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হলে মাওলানা তর্কবাগীশ এর প্রতিবাদস্বরূপ আইন পরিষদ ভবন থেকে ওয়াক-আউট করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি মুসলিম

---

[১] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১৮।

[২] ফাইজুস-সালেহীন, *চিরঞ্জীব মওলানা*, সাধারণ প্রকাশনী, ঢাকা, তারিখবিহীন, পৃ. ৯।

[৩] *Biographical Encyclopaedia Of Pakistan*, Ibid, p. 46.

[৪] *চিরঞ্জীব মওলানা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

[৫] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৩৯।

[৬] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৫৫।

[৭] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারির তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।[১] তিনি ১৮ মাস কারাবরণের পর ১৯৫৩ সালের ৩১ জানুয়ারি মুক্তি লাভ করেন।[২] মাওলানা তর্কবাগীশ ১৯৫৩ সালে নিখিল পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।[৩] ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট থেকে পূর্ববংগের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হন।

মাওলানা তর্কবাগীশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৫ সালের ১২ আগস্ট গণপরিষদে সর্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা দেন।[৪] মাওলানা তর্কবাগীশ আইয়ুব খান প্রণীত ১৯৬২ সালের মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচন বর্জন করেন।[৫]

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে মাওলানা তর্কবাগীশ আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন জানান।[৬]

১৯৬৮ সালে পি ডি এম (পাকিস্তান ডেমোক্রোটিক মুভমেন্ট) গঠিত হলে মাওলানা তর্কবাগীশ এর নেতৃত্ব দেন।[৭]

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সর্বশেষ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাওলানা তর্কবাগীশ উল্লাপাড়া এবং রায়গঞ্জ ও তাড়াশের দুটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে বিপুল ভোটে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[৮]

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতাশেষে মাওলানা তর্কবাগীশ মুনাজাত পরিচালনা করেন।[৯]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাওলানা তর্কবাগীশ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি 'উলামা পার্টি' গঠন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। তিনি উলামা পার্টির সভাপতি ছিলেন।

মাওলানা তর্কবাগীশ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গণপরিষদের ১ম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।[১০] তাঁর সভাপতিত্বেই সংসদের স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়।

১৯৭২ সালে মাওলানা তর্কবাগীশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এ সময় গঠিত মাদরাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন মাওলানা তর্কবাগীশ।[১]

---

[১] *দৈনিক ইনকিলাব*, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, *ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১৩; *মহানাগরিক*, ৫ম বর্ষ, তয় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫৩।

[২] Tahawar Ali khan (ed), *Biographical Encyclopaedia Of Pakistan*, Biographical Research Institute, Pakistan, Lahore, 1965-66, p. 46.

[৩] *মহানাগরিক*, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ২৯।

[৪] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২৮-২৯।

[৫] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২৬।

[৬] শাহ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *শতাব্দীর সংগ্রামী পুরুষ মওলানা তর্কবাগীশ*, তর্কবাগীশ একাডেমী, ঢাকা, তারিখবিহীন, পৃ. ১০।

[৭] *শতাব্দীর সংগ্রামী পুরুষ মওলানা তর্কবাগীশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[৮] *সাপ্তাহিক আরাফাত*, ঢাকা, ১৫ ভাদ্র ১৩৯৩/১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৬; *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৫৬।

[৯] *শতাব্দীর সংগ্রামী পুরুষ মওলানা তর্কবাগীশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

[১০] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা তর্কবাগীশকে বায়তুল মুকাররম মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। মাওলানার প্রচেষ্টায় ইসলামিক একাডেমি ও বায়তুল মুকাররম সোসাইটিকে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে একীভূত করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২]

১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় মাওলানা তর্কবাগীশের নেতৃত্বে দশ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়।[৩]

মাওলানা তর্কবাগীশ একজন যুক্তিবাদী ও বাগ্মী ছিলেন। সেজন্য তাঁকে 'তর্কবাগীশ' বলা হতো।[৪] তাঁর লিখিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই 'সমকালীন জীবনবোধ' ও 'শিরাজী স্মৃতি'।

ইন্তেকাল

মাওলানা তর্কবাগীশ ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট বুধবার ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বনানীতে দাফন করা হয়।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে চেয়েছিলেন। মাওলানার শিক্ষাদর্শন ছিল দীন-দুনিয়ার সমন্বয়ধর্মী। তিনি বিশ্বাস করতেন : "বাস্তববর্জিত ধর্মশিক্ষা কোন জাতি গঠনে সমর্থ নয় এবং ধর্মবর্জিত বাস্তব শিক্ষাও কোন জাতিকে নিষ্কলুষ চরিত্র দান করতে পারে না।[৫] তিনি মনে করতেন, কেবল কুর'আনের নীতিমালার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।[৬] তিনি চেয়েছেন শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ। তিনি বলতেন, প্রাথমিক যুগের খলীফাদের শাসনকালে মুসলিম সমাজে যথার্থ সামাজিক সহাবস্থান বিদ্যমান ছিল। তাই আমাদেরকেও সেই আদর্শ ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করতে হবে।[৭]

তিনি পীরবংশে জন্ম হয়েও পীর-মুরীদীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন :

"শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার ফলস্বরূপ, আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের জন্য, স্রষ্টার সংগে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য একদল মাধ্যম দাঁড়িয়ে যায়। অথচ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সংগে মানুষের আত্মিক উন্নয়নে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। এ ক্ষেত্রে কোন মাধ্যম নেই। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামেও পৌরহিত্য প্রথা সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৮]

মাওলানা তর্কবাগীশ রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক মনে করতেন না। তিনি বলতেন :

"ধর্মের সংগে রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনীতির মর্মকথাঃ নিজের অধিকারকে যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করা, তেমনি অন্যের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া। নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত

---

[১] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৩১।
[২] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৪।
[৩] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৩২।
[৪] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, *জেলা পাবনার ইতিহাস* (৩য় খন্ড), ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৭৬।
[৫] আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, *সমকালীন জীবনবোধ*, সুকথা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ৫।
[৬] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৩।
[৭] *মহানাগরিক*, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০, পৃ. ৬।
[৮] আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, *সমকালীন জীবনবোধ*, সুকথা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে অন্যের অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব করা চলবে না। এই সত্য যদি দুনিয়ার সকলেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতো, তাহলে দুনিয়ায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ ঘটতো না।"[১]

মাওলানা তর্কবাগীশ ছিলেন বাংলার বিশিষ্ট আলিম, নির্ভীক ও আপোষহীন রাজনীতিক, সংগঠক, কৃষক-প্রজা আন্দোলনের অন্যতম দিশারী, আযাদী আন্দোলনের সেরা নকীব ও ইসলামী চিন্তাবিদ। সাত দশকের রাজনৈতিক জীবনে মাওলানা তর্কবাগীশ বৃটিশ বিরোধী খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, ঋণ-সালিশী বোর্ড গঠন-আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, বায়ান্নর বাংলাভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন, বাষট্টির গণমুখী শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের আইয়ুব বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের স্বাধিকার আন্দোলন ও নির্বাচন, একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। মূলত তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ উৎখাতে তার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ইসলাম ও দেশের স্বার্থে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

[১] *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; *সমকালীন জীবনবোধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হুদা পাঁচবাগী

[১৮৯০-১৯৮৮]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হুদা আনুমানিক ১৮৯০ সালে গফরগাঁও জেলার পাঁচবাগ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা রিয়াযুদ্দীন আহমদ। মাওলানা পাঁচবাগী ১৮ বছর বয়সে ঢাকার মুহসিনিয়া মাদরাসা থেকে জামাআত-এ-উলা (ফাযিল) পাস করেন। এরপর তিনি উত্তর ভারতের রামপুর মাদরাসায় এবং লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে অধ্যয়ন করেন।[১]

আন্দোলন ও সংগ্রাম

মাওলানা পাঁচবাগী শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে স্থানীয় ধলা, আঠারবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও শোষণ করতো তার বিরুদ্ধে তিনি এলাকার জনগণকে নিয়ে রুখে দাঁড়ান।[২]

মাওলানা সর্বপ্রথম ধলার জমিদার যোগেশ বাবুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি জমিদার, তালুকদার ও মহাজনের সকল ধরনের কর দিতে প্রজাদের নিষেধ করেন। ১৯২৬ সালে এ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে ধলার জমিদার মাওলানা পাঁচবাগীর বিরুদ্ধে ২৮টি মামলা দায়ের করে। কিন্তু জমিদার সবগুলো মামলায় পরাজিত হয়।

কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সুবাদে এ. কে. ফজলুল হক ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে মাওলানা পাঁচবাগীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। মাওলানা পাঁচবাগী কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসেবে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে বিজয়ী হয়ে বংগীয় আইন সভার সদস্য হন। তিনি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন।[৩]

মাওলানা পাঁচবাগী ছিলেন স্বাধীন বাংলার প্রবক্তা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বেই তাঁর প্রচার মাধ্যমে তিনি স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি প্রচারপত্রের হুবহু নকল নিম্নে পেশ করা হলো :

"মিছে কেন পাকিস্তান জিন্দাবাদ
ইংরেজ তাড়াই, পাঞ্জাবী আনতে চাই
বাংলা নহে স্বাধীন, বাংলা চিরপরাধীন
পাকিস্তান নয়, ফাঁকিস্তান
পাকিস্তান হবে জালেমের স্থান।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তিনি তা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অন্য একটি প্রচারপত্রে বলেন :

"আমরা নিখিল বাংলার সন্তান

---

[১] *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজুদ্দৌলার বাংলা নামে অভিহিত
কলিকাতাময় নিখিল বাংলা
অবশ্যই চাই।
মোদের এহেন দাবী করিতে হবে পূরণ
মন্ত্রের সাধন হোক, আর শরীর পতন।
কে রোধিতে পারে প্রাক্তনের গতি,
মোদের আন্দোলন চলিবে নিতি।
তাই বলি,
ওগো পান্থ কেন ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে পুরে কিবা কার মনোরথ।"[১]

মাওলানা পাঁচবাগী ১৯৪১-১৯৪২ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কলকাতায় "নিখিল বংগ ইমারত পার্টি" গঠন করেন। তিনি ছিলেন এ সংগঠনের সভাপতি।[২] তিনি অন্যায় ও অবিচার প্রতিরোধের জন্য 'ফৌজ-এ এলাহী' নামক বিশেষ বাহিনীও গঠন করেছিলেন।

মাওলানা পাঁচবাগী ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে 'ইমারত পার্টি'-র প্রার্থী হিসেবে গফরগাঁও-ভালুকা এলাকা থেকে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

মাওলানা পাঁচবাগী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে 'মোদের কপালে ছাই/রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এ শিরোনামে অসংখ্য প্রচারপত্র ছড়িয়ে ময়মনসিংহের জনসাধারণকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সোচ্চার করেন।[৩]

তিনি ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে গফরগাঁও–ভালুকা এলাকা থেকে পূর্ববংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাওলানা পাঁচবাগী মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন।

সেবামূলক কাজ

মাওলানা পাঁচবাগী ১৯২১ সালে গফরগাঁওয়ে একটি সিনিয়র মাদরাসা, একটি হাইস্কুল ও একটি ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ময়মনসিংহ শহরে একটি মহিলা কলেজ স্থাপন করেন। তিনি বাংলা, উর্দু, আরবী ও ইংরেজীতে কয়েকটি ধর্মীয় ও নীতিমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেগুলো পাঁচবাগের 'আনজুমান-এ- হেমায়েতুল ইসলাম' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁর 'দীন-দুনিয়া' পত্রিকাটি ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে পাঁচবাগ ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে 'মাদরাসা ম্যাগাজিন' নামে দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৪] এছাড়া মাওলানা পাঁচবাগী ১৯৪২ সালে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নামক একটি

---

[১] *সুন্নত অল-জামায়াত*, কলকাতা, ৯ম বর্ষ, মাঘ ১৩৪৮/১৯৪১, পৃ. ৪৭।
[২] *সুন্নত অল-জামায়াত*, কলকাতা, ৯ম বর্ষ, মাঘ ১৩৪৮/১৯৪১, পৃ. ৪৭।
[৩] *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।
[৪] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪৫০।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি বিজাতীয় রীতিনীতি, পীর-পূজা, পীরের দরগায় মান্নত ইত্যাদি শিরকী কর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[১]

ইন্তেকাল

মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী ১৯৮৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর ময়মনসিংহস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে পাঁচবাগের করবস্থানে দাফন করা হয়।

মাওলানা পাঁচবাগীর মৃত্যু উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এই শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় :

শেরে বাংলা ও মাওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহচর ও বিশিষ্ট আলিম মাওলানা সামছুল হুদা পাঁচবাগী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসেবে গফরগাঁও-ভালুকা নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রথমবার বংগীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তিনি একাধারে অনেক বছর পর্যন্ত নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। বৃটিশ ও জমিদারী প্রথা বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যুক্ত ও মুক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীনতাকামী ও জমিদার বিরোধী এক হাজার একশটি মামলায় তিনি জয়লাভ করেন। তিনি 'ইমারত পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নামে আরবী ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।[২]

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন, ধর্মীয় পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, শিরক-বিদ'আতের বিরোধীতা ও অত্যাচারী-নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগীর উল্লেখযোগ্য অবদান।

---

[১] *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭-২৭৮।

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, শোক প্রস্তাবসমূহ (চতুর্থ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে উদ্বোধনী বৈঠকে ১৬-১০-৮৮ ইং তারিখে সংসদ-নেতা কর্তৃক উত্থাপনীয়, পৃ. ২); *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মনযুরুল হক

[১৯০৩-১৯৯১]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা মনযুরুল হক ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া থানাস্থ ভুলগাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা আলীমুদ্দীন আহমদ। মাওলানা মনযুরুল হক কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানাস্থ জংগলবাড়িয়া সিনিয়র মাদরাসায় জামাআত-এ-চাহারম পর্যন্ত পড়েন। পরে সিলেট জেলা সদর আলিয়া মাদরাসা থেকে জামাআত-এ-উলা (ফাযিল) পাস করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে হাদীস বিষয়ে দুই বছর অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি লাহোরে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর নিকট এক বছর অধ্যয়ন করেন।[১]

শিক্ষকতা

মাওলানা মনযুরুল হক ১৯৩৯ সালে লাহোর থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকা জেলার মনোহরদী থানাস্থ সাড়রাবাদ সিনিয়র মাদরাসায় এক বছর হেড মাওলানা পদে শিক্ষকতা করেন। এরপর নেত্রকোনা আঞ্জুমান আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে হেড মৌলবী পদে নিযুক্ত হন।

রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা মনযুরুল হক ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন।[২] ১৯৪৫ সালের ২৬-২৯ অক্টোবর কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে 'জমিয়ত'-এ-উলামা-এ ইসলাম'-এর অনুষ্ঠিত সভায় ময়মনসিংহ জেলার প্রতিনিধি হিসেবে মাওলানা মনযুরুল হক, মাওলানা সৈয়দ ফয়যুর রহমান ও মাওলানা আতহার আলী যোগ দেন। মাওলানা মনযুরুল হকের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে নেত্রকোনার মোক্তারপাড়া মাঠে 'জমিয়ত'-এ-উলামা-এ ইসলাম'-এর পূর্ববংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মনযুরুল হক ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত সিলেট- রেফারেণ্ডামে (গণভোটে) সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলন করেন।[৩]

১৯৫২ সালে পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতিপয় আলিমের নেতৃত্বে কিশোরগঞ্জের হযরতনগরে 'নেজামে ইসলাম' পার্টি গঠিত হয়। তখন এ পার্টির ময়মনসিংহ জেলার সভাপতি হন মাওলানা আতহার আলী এবং সেক্রেটারি হন মাওলানা মনযুরুল হক।

মাওলানা মনযুরুল হক ১৯৫৪ সালে পূর্ববংগীয় প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মোহনগঞ্জ, আটপাড়া, বারহাট্টা নির্বাচনী এলাকায় বিজয়ী হয়ে পূর্ববংগীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[৪]

---

[১] *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭।

[৪] *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

সেবামূলক কাজ

মাওলানা মনযুরুল হক নেত্রকোনার গারো পাহাড়ের পাদদেশে একটি অনগ্রসর জনপদে অনেক মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন করেছেন। তিনি নেত্রকোনা শহরের এন. আকন্দ আলিয়া মাদরাসা ও মিফতাহুল উলূম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মিফতাহুল উলূম মাদরাসায় তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে বহাল ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান আমলে নেত্রকোনা শহর থেকে পতিতালয় উচ্ছেদ হয়েছিল।[১]

ইন্তেকাল

মাওলানা মনযুরুল হক ১৯৯২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর নেত্রকোনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নেত্রকোনার মিফতাহুল উলূম মাদরাসা চত্বরে দাফন করা হয়।[২]

ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, দ্বীন শিক্ষা প্রদান, মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ উৎখাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রভৃতি মাওলানা মনযুরুল হকের উল্লেখযোগ্য অবদান।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

[২] জসীম উদ্দীন খান পাঠান, *মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা মনযুরুল হক-(র.)*, দ্র. *মাসিক জাগো মুজাহিদ* (ময়মনসিংহ), নভেম্বর ১৯৯২ পৃ. ৩৩-৩৫; *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর

[১৯০০ - ১৯৮৭]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর ১৮৮৮ সাথে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানার অন্তর্গত লুধুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মিয়াজী মুহাম্মদ ইদ্রীস।[১]

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্‌র পড়ালেখা শুরু হয় নিজ গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি কুর'আন শিক্ষার জন্যে পানিপথ মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে কুর'আন হেফজ শুরু করেন।[২] অতঃপর কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কুর'আন মজীদ হেফ্‌জ সম্পন্ন করেন। হেফ্‌জ শেষে তিনি 'হাফেজ্জী' বলে সম্বোধিত হতে থাকেন।[৩] অতঃপর তিনি ভারতের সাহারানপুর মাজাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর ভর্তি হন দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায়। এখান থেকে দাওরা-ই-হাদীস কোর্স সমাপ্ত করেন।[৪]

কর্মজীবন

মাওলানা হাফেজ্জী হুযুর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তণ করে ১৩৪৪ হিজরী সালে কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সর্বপ্রথম মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তখন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী তাঁর হাফেজ্জী নামের সাথে 'হুযুর' শব্দটি যোগ করেন। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সহ তাঁর অন্যান্য যোগ্য সহকর্মীদের পারস্পরিক পরামর্শে সারা দেশে ফোরকানিয়া মাদরাসা ও দ্বীনি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। অতঃপর ঢাকাকে কেন্দ্র করে তাঁরা এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্রতী হন। এ মহৎ উদ্যোগকে সুগম করার জন্য মাওলানা হাফেজ্জী হুযুর লালবাগ শাহী মসজিদে ইমামতি গ্রহণ করেন। আর শামসুল হক ফরিদপুরী জিঞ্জিরার হাফেজ হোসাইন আহমদের বাড়ীর জামে মসজিদে তাফসীর আরম্ভ করেন। পীরজী মাওলানা আবদুল ওহাব শহরেই অন্য একটি মসজিদের ইমামতি গ্রহণ করেন। অতঃপর জিঞ্জিরার উক্ত হাফেজ হোসাইন আহমদ বড় কাটরার একটি পুরাতন দালানে মাদরাসা খোলার অনুমতি প্রদান করায় মাওলানা ফরিদপুরী, পীরজী মাওলানা আবদুল ওহাব এবং হাফেজ্জী হুযুর এই তিন জনে ১৯৩৪ সালে বড় কাটরায় মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও হাফেজ হোসাইন

---

[১] মাওলানা সালাউদ্দীন জয়নাল, *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রকাশক : মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ২০০৮, পৃ. ১১; মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২৫৭; মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৩৪২; মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক, *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৪, পৃ. ১৬৬।

[২] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৪; *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৯।

[৩] *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬; *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

[৪] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ সাহেবের নাম মিলিয়ে 'হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদরাসা' স্থাপন করেন। অতঃপর ১৯৪৯ সাথে লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে 'জামেয়া-এ-কোরআনিয়া' লালবাগ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হাফেজ্জী হুযুর এ মাদরাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ উজ্জ্বল অবদান হলো কামরাঙ্গির চরে প্রতিষ্ঠিত 'জামেয়া নূরিয়া ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠানটি। তিনি সেখানে একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

সংস্কারমূলক অবদান

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাদরাসা গড়ে তোলার পর দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষকে তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অহ্বান জানান।[২] তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পূর্বে ক্ষমতাসীন শাসকদেরকে ভ্রান্ত পথ পরিহার করে এই মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামী হুকুমতে পরিণত করার আহ্বান জানাতেন।[৩]

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি আহ্বান

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের অনুসারী হবার জন্যে ১৯৭৮ সালের মে মাসে আহ্বান জানান। ১০ সদস্যের একটি ওলামা প্রতিনিধিদলসহ হাফেজ্জী হুযুর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : "মাননীয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান!... 'মুসলমানগণ ক্ষমতার অধিকারী হইলে তাহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল খোদায়ী বিধান চালু করা। কিন্তু আজ সীমাহীন পরিতাপের সহিত বলিতে হয় যে, আপনার এবং আপনার সরকারের ছত্রছায়ায় অগণিত অন্যায়, কুকর্ম, অশ্লীলতা ও আদর্শবিরোধী আচার-আচরণ এবং অনৈসলামিক সংস্কৃতি একের পর এক জাতীয় আদর্শের উপর নগ্ন হামলা চালাইয়া যাইতেছে। ... আপনি পর্দাপ্রথার বিলোপ সাধনে এমনভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন যে উহার ফলে ঈমান ও নৈতিকতার সকল সীমা লংঘিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সম্মানিত মাতৃজাতির অবমাননা ও নিরাপত্তাহীনতা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। আল্লাহ্ পাক এই দেশ পরিচালনার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব আপনাকে দান করিয়াছেন। প্রয়োজন ছিল যে, আপনি একজন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কুর'আন-সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও জারি করিবেন। খোদা না করুন, যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান মোতাবেক অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র আযাব আপনার সকল শান-শওকত খতম করিয়া দিবে। তখন কেহ আপনার সাহায্যকারী থাকিবে না।"[৪]

---

[১] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৭; *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৬; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬।

[২] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।

[৩] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭; *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[৪] *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরূপে হাফেজ্জী হুযুর

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর মুসলিম শাসকদের সংশোধনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ফলে ১৯৮১ সালের ২৮ শে আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমা' লালবাগ শাহী মসজিদে তিনি নিজেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন।[১] প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি প্রচলিত রাজনীতি করার জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ হইনি। নিছক ক্ষমতা লাভ বা গদি দখল করাও আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য ইসলামী আন্দোলনের পথ সুগম করা। আমার শেষ লক্ষ্য ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করা। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ইংরেজদের কবল হতে (১৯৪৭ সালে) দেশ স্বাধীন করা হয়েছিল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তাব্যক্তিরা এ বিষয়ে শুধু অবহেলাই দেখান নি বরং এর বিরোধিতায়ও ছিলেন তৎপর। ... দেশে আজ ঘুষ, দুর্নীতি ও জোর-জুলুমের অবাধ রাজত্ব। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় দেশ সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। অপকর্ম নিজে করা যেমন অপরাধ, এর সমর্থন করাও তেমনি অপরাধ। এই অপরাধে আমরা সবাই অপরাধী। এরূপ চলতে থাকলে আল্লাহ্র আযাব নেমে আসবে। আর এদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। অতএব আসুন, বিগত জীবনের অপরাধ হতে তাওবার নিয়্যাতে দেশে এমন শাসন কর্তৃত্বের স্বপক্ষে আমাদের ভোট-ক্ষমতা প্রয়োগ করি, যাদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায় যে, তারা দেশে নিশ্চিতভাবে ইসলামী হুকুমত কায়েম করবেন। দেশের আপামর জনসাধারণের ঈমান এবং জীবিকা নিয়ে যে অপশক্তি এতদিন রাষ্ট্র পরিচালনার নামে একটি নির্মম পরিহাস চালাচ্ছে, সেই অপশক্তির বিরুদ্ধেই আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছি।"

১৯৮১ সালে ২৮ শে আগস্ট তারিখে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হাফেজ্জী হুযুর ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৭৪১ ভোট পেয়ে নির্বাচনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[২]

'খেলাফত আন্দোলন' সংগঠন প্রতিষ্ঠা

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষে দেশের ওলামা-মাশায়িখ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে (১৯৮১-এর) ২৯ শে নভেম্বর লালবাগ শায়েস্তাখান হলে একটি সম্মেলন করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি 'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন স্থাপনের ঘোষণা দেন। সম্মেলনে হাফেজ্জী হুযুরকে এ সংগঠনের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৩]

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হাফেজ্জী হুযুর

হাফেজ্জী হুযুরের হঠাৎ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দেশের সংবাদপত্রও বিষয়টিকে বেশ ফলাও করে প্রচার করে। তাছাড়া ৫৩ দিনের নির্বাচনী প্রচার-প্রচারনায় বিপুল পরিমান ভোট প্রাপ্তিতে এবং দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারের সুবাদে হাফেজ্জী

---

[১] *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।

[২] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৩৫১।

[৩] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৫২; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

হুযুর খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন। নির্বাচন শেষে সৌদী আরব, লিবিয়া, ইরান, ইরাকসহ মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশের বাংলাদেশেস্থ রাষ্ট্রদূতগণ হাফেজ্জী হুযুরের সাথে এসে সাক্ষাৎ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাঁকে তাদের দেশে আসার আমন্ত্রণ জানান। হাফেজ্জী হুযুর ইরান-ইরাকের যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে উভয় দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করার জন্যে ১৯৮২ সালের ২ রা সেপ্টেম্বর এক প্রতিনিধি দল নিয়ে উপসাগরীয় দেশ দু'টিতে সফর করেন। প্রথমে তিনি ইরান সফর করে ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী সহ বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেন। ১৯৮২ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। হাফেজ্জী হুযুর ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব পেশ করলে ইরান তাতে সম্মত হয়। অতঃপর ১৯৮২ সালের ৫ই অক্টোবর ইরাক সফর করেন এবং ৯ই অক্টোবর ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন।[১]

লন্ডন সফরে হাফেজ্জী হুযুর

হাফেজ্জী হুযুর ১৯৮৫ সালের ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা 'লন্ডন মুসলিম ইনষ্টিটিউট' কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে ১০ জন সফরসঙ্গীসহ লন্ডনে যান। হাফেজ্জী হুযুর ঐ সম্মেলনে ৫ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ হলো :

(১) কুর'আনের আয়াত ই'তেসাম বিহাব্‌লিল্লাহ-র ভিত্তিতে সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, জিহাদ অব্যাহত রাখা এবং ধর্মপ্রাণ ওলামা বুদ্ধিজীবী সমন্বয় দ্বারা খলীফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মু'মিনীন নির্বাচন করা আবশ্যক। একটি মজলিসে শূরার পরামর্শে, খলীফা বা আমীর মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনা করবেন।

(২) খেলাফতের প্রধান কর্মস্থল হবে মক্কা অথবা মদীনায়।

(৩) একটি ওলামা সংস্থা উপসাগরীয় যুদ্ধসহ সকল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-নিষ্পত্তি করবে। কোন পক্ষ সংস্থার রায় অমান্য করলে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র সে পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে বশে আনবে।

(৪) মুসলিম দুনিয়ার যোগাযোগের ভাষা হবে আরবী এবং খেলাফতের ভাষা হবে আরবী আর 'খেলাফতে ইসলামিয়ার' একটি বেতার কেন্দ্র থাকবে।

(৫) বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সমন্বয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলন সংস্থাগুলোকে সাহায্য প্রদান এবং ইহুদীদের দখল থেকে ফিলিস্তীন ও প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি বায়তুল মাল গঠন করা দরকার।[২]

ইন্তেকাল

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর ১৯৮৭ সালের ৭ই মে বৃহস্পতিবার ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ৯৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পরদিন শুক্রবার জাতীয় ঈদগাহ্ মাঠে জানাযা

---

[১] *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৯; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

[২] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪; *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

শেষে তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কামরাঙ্গীর চরস্থ জামেয়া নূরিয়ার মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাহিত করা হয়।[১]

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযুর ছিলেন এ উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা আলিম। তিনি কুর'আন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে মাদরাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে আজীবন দ্বীনের কাজ করে গেছেন। তিনি বিলম্বে হলেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্কের বিষয়টি মানুষের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলাম ও মুসলিম উম্মার স্বার্থে তার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সর্বত্র প্রশংসা লাভ করেছে।

---

[১] *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী-এ-আজম মাওলানা ফয়েজুল্লাহ

[১৮৯২ -১৯৭৬]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মুফতী ফয়জুল্লাহ ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে হাটহাজারীর মিখল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুনশী হেদায়াত আলী চৌধুরী।[১]

মুফতী ফয়েজুল্লাহ নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের বিখ্যাত দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি দশ বছর শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হন। তিনি সেখানে দু'বছরে 'সিহাহ সিত্তা' হাদীস ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।[২] শিক্ষাশেষে ফয়েজুল্লাহ ১৯১৫ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং দারুল উলূম হাটহাজারীতে ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতা ছাড়াও ফতওয়া দানের দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল। শরী'য়তকে অপসংস্কৃতি থেকে নির্ভেজাল রাখাই ছিল তাঁর ব্রত।[৩] শেষ জীবনে দারুল উলূম হাটহাজারী থেকে অবসর গ্রহণ করে নিজ গ্রামে 'মাদরাসায়ে হামিউচ্ছুন্নাহ' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করেন।[৪]

রচনাবলী

মুফতী ফয়জুল্লাহ্ আরবী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি এসব ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেলেন। যেমন- (১) পান্দেনামা-এ-খাকী (২) উমদাতুল আক্বওয়াদ ফীল রাদ্দে মা ফী আহসানিল মাক্বাল (৩) আররিসালাতুল মানযূমাহ (৪) আলকালামুল ফাসিল বাইনা আহ্লিল হাক্কি ওয়াল বাতিল (৫) ইরশাদুল উম্মাহ ইলাত্ত্বাফরীক্বি বাইনাল বিদ'আতি ওয়াস সুন্নাহ (৬) রাহে হক্ব (৭) রফিউল ইশকাতাল আলা হুরমাতিল ইস্তীজার আলাত্তাআহ (৮) আল-ফাযালাতুল জালীলাহ লিআহ্কামিস সাজদাতিত্ত্বাহিয়্যাহ (৯) হক্ব কী রাহ্নুমায়ী (১০) আলকাওলুস সাদীদ ফীল হুকমিল আহওয়াল ওয়াল মাওয়াজীদ (১১) মসনভী-এ-খাকী (১২) ফয়েজ-এ-সাত্তার (১৩) ফয়েযে বেহাহ (১৪) ফয়েযে বেপায়া (১৫) তা'লীমুল মুবতাদী লিল্লিসানিল 'আরাবী (১৬) সিরাজুত্তাবলীগ (১৭) আলফালাহ ফীমা ইয়াতা'আল্লাকু বিন্নিকাহ (১৮) ইযহারুল ইখতিল্লা ফী রিসালাতিল ই'তিদাল ফী মাস'আলাতিল হিলাল (১৯) ফয়েযুল কালাম লিসাইয়িদিল আনাম (২০) আলমাসলাকুস সারীহ (২১) ইসলাহুন্নাফ্স।[৫]

---

[১] মাওলানা আমীরুল ইসলাম, *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, কোহিনূর লাইব্রেরী, ২০১২, পৃ. ৩৫; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

[২] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

[৩] *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

[৪] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

[৫] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল

মুফতী ফয়েজুল্লাহ ১৯৭৬ সালে ইন্তেকাল করেন। নিজ গ্রামে 'মেখলে' পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১]

মুফতী ফয়েজুল্লাহ ছিলেন একজন সংগ্রামী আলিম। তিনি ইসলামকে বিভিন্ন কুসংস্কার, বিদ'আত-শিরক ও বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষায় এবং দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। নিজের জীবনকে করেছিলেন ইসলামের সেবায় উৎসর্গ। কুর'আন-সুন্নাহ বিরোধী কাজ দেখে তিনি নীরব থাকতে পারতেন না। তিনি ন্যায় এবং সত্য কথা সমাজের সামনে তুলে ধরাকেই প্রধান দ্বীনী কর্তব্য মনে করতেন। তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থাবলী ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

[১] *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
[১৯১৮-১৯৮৭]

পরিচয়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১৯১৮ সালে পিরোজপুর জেলার কাউখালি থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

শিক্ষা ও কর্মজীবন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম নিজ বাড়ীর ইবতেদায়ী মাদরাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৩৮ সাথে আলিম পাস করেন। অতঃপর কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৪০ সাথে ফাযিল ও ১৯৪২ সালে কামিল (মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন) পাস করেন। অতঃপর কলকাতা আলিয়া মাদরাসাতেই (১৯৪৩-১৯৪৫ সাল) গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বরিশালের নাজিরপুর ও কেউন্দিয়া কাউখালী মাদরাসার প্রধান মাওলানা হিসেবে চার বছর নিয়োজিত ছিলেন। গতানুগতিক কোন ধরাবাঁধার চাকুরি তিনি পছন্দ করতেন না বলে জীবনে আর কোন চাকুরিতে যোগ দেননি।[২]

লেখক ও গবেষক হিসেবে আবদুর রহীম

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমৃত্যু জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'আল-কুর'আনের অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র ইতিহাস' শীর্ষক দু'টি গবেষণা প্রকল্পে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮-৭১ পর্যন্ত ইসলামী রিসার্চ একাডেমীর (পুরানা পল্টন) পরিচালক, ১৯৭১-৭৬ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)-এর চেয়ারম্যান এবং একই সময় ইসলামী অর্থনীতি গবেষণা ব্যুরোর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ থেকে একমাত্র সদস্য হিসেবে রাবেতা-এ-আলম আল ইসলামী এবং ওআইসির ফিকাহ কমিটির সদস্য ছিলেন।[৩]

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১৯৫৯-৬০ সালে দৈনিক নাজাতের জেনারেল ম্যানেজার; সাপ্তাহিক 'জাহানে নও'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন; ১৯৪৫ সাল থেকে যে সব পত্রিকায়

---

[১] নূর হোসেন মজিদী, *মাওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন, মাম্মী প্রকাশনী,* ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১; অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা,* ১ম খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩০; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

[২] *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

[৩] *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত লিখতেন সেগুলো হলো সাপ্তাহিক নকীব, মাসিক মোহাম্মদী (কলকাতা ও ঢাকা), ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মাসিক হেদায়েত, মাসিক সুন্নাত আল-জামাত, মাসিক পৃথিবী, মাসিক মদীনা, মাসিক তাহজীব, মাসিক চেরাগে রাহ (করাচী), মাসিক তাওহীদ, মাসিক মঞ্জিল, মাসিক কুর'আন হুদা (করাচী), দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ডাইজেষ্ট, ত্রৈমাসিক কলম, সাপ্তাহিক মিজান (কলকাতা), দৈনিক পূর্বদেশ, সন্ধান (ইসলামাবাদ), সাপ্তাহিক নাজাত, দৈনিক সংগ্রাম প্রভৃতি ।[১]

রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ছিলেন উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃত। ১৯৪৫ সালে মাওলানা মওদূদীর বিপ্লবী পুস্তকসমূহের সাথে পরিচিত হবার পর জামায়াতে ইসলামী হিন্দে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে ইসলামী মৌলিক সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেন। উর্দু থেকে অনূদিত বিভিন্ন লেখা এবং ইসলামী বিষয় বস্তুর উপর বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমানে প্রকাশ করতে শুরু করেন। পাকিস্তান হবার পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজে মনোযোগী হন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী হিসেবে ১৯৫১-৫৫ সাল, ১৯৫৬-৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর, ১৯৬১-৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে মধ্যে ১৯৪৮-৪৯ পাকিস্তানের আদর্শ প্রস্তাব, ১৯৫১-৫৬ ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা, ১৯৬০-৬১ সালে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামী নীতিমালা প্রতিষ্ঠার জন্য ৬৪ জন জামায়াত নেতাসহ তিনি কারাবরণ করেন। জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১-এর শেষ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত নেপালের কাঠমুণ্ডুতে অবস্থান করে এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দেশের সব ইসলামী দল ও শক্তিকে একটি মাত্র দলে পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে ইসলামিক ডেমোক্রেটিট লীগ গঠন করে তিনি এ সংগঠনের সহ-সভাপতি হন। পরের বছর ১৯৭৭ সালে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে তিনি সহ ৬ জন দল থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' গঠন করেন। ১৯৮৭ সালের ৩ মার্চ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' আত্মপ্রকাশ করে।[২]

পুরস্কার লাভ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১৯৭৭ সালে ইসলামিল ফাউন্ডেশন গবেষণা কর্ম পুরস্কার; ১৯৮৩ সালে অনুবাদের জন্য পুরস্কার লাভ করেন।[৩]

সফর ও সম্মেলন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে

---

[১] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, ইসলামী গুণীজন সম্মেলন, রিয়াদে অনুষ্ঠিত ১৫ শত হিজরী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন ও মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী ফিক্‌হ কমিটির সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে তেহরানে ইসলামী বিপ্লবের ৪র্থ বিজয় বার্ষিকীতে যোগদান ও ইমাম খোমেনীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া তিনি আরব-আমিরাত, ভারত, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ সফর করেন।[১]

পারিবারিক জীবন

মাওলানা আবদুর রহীম ১৯৪১ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ৮ ছেলে এবং দুই কন্যা সন্তান।[২]

ইন্তেকাল

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১ লা অক্টোবর, ১৯৮৭ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ২৯ মিনিটে ঢাকার রাশমনো হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।[৩]

সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অবদান

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিম, চিন্তাবিদ, সংস্কারক, দার্শনিক এবং দেশ প্রেমিক। মানুষের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটুক তা তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন। তাই তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে বেড়িয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে অনেকগুলো মৌলিক, অনুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাঁর মৌলিক গ্রন্থসমূহ : কালেমায়ে তাইয়েরা (১৯৫০), ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা (১৯৫২), ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া (১৯৫৩), কমিউনিজম ও ইসলাম (১৯৫৪), সূরা ফাতিহার তাফসীর (১৯৬৩), পাক-চীন বন্দুত্বের স্বরূপ (১৯৬৬), তাওহীদের তত্ত্বকথা (১৯৬৭), সুন্নাত ও বিদ'আত (১৯৬৭), হাদীস শরীফ ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯৬৭), হাদীস সংকলনের ইতিহাস (১৯৬৯), ইক্‌বালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা (১৯৬০), পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ (১৯৬৯), অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহাম্মদ (সা) (১৯৭০), হযরত মুহাম্মদের অর্থনৈতিক আদর্শ (১৯৭১), ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (১৯৭১), খেলাফতে রাশেদা (১৯৭৪), হাদীস শরীফ ২য় ও ৩য় খণ্ড (১৯৭৫), মহাসত্যের সন্ধানে (১৯৭৭), নারী (১৯৭৮) ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন (১৯৭৯), ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান (১৯৭৯), খোদাকে অস্বীকার করা হচ্ছে কেন? (১৯৮০), আজকের চিন্তাধারা (১৯৮০), আল-কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ (১৯৮০), অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম (১৯৬৬), চরিত্র গঠনে ইসলাম (১৯৭৭), বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৭৭), ওমর ইব্‌ন আবদুল আজিজ (১৯৭৭), জিহাদের তাৎপর্য (১৯৭৮), ইসলামে জিহাদ (১৯৮৬), পরিবার ও পারিবারিক জীবন (১৯৮৪), পাশ্চাত্য সভ্যতার

---

[১] *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

[২] *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

[৩] *মাওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক ভিত্তি (১৯৮৫), ইসলাম ও বীমা (১৯৮৫), হাদীস শরীফ ৫ম খণ্ড (১৯৮৬), আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা (১৯৭৬)।

অনুবাদ গ্রন্থসমূহ : ইসলামের জীবনপদ্ধতি (১৯৪৯), ঈমানের হাকিকত (১৯৫০), ইসলামের হাকিকত (১৯৫০), নামায-রোযার হাকিকত (১৯৫১), যাকাতের হাকিকত (১৯৫১), হজ্জের হাকিকত (১৯৫০), ইসলামের দাওয়াত ও কর্মনীতি (১৯৫৪), আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা (১৯৫৪), মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী (১৯৫৪), আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (১৯৫৫), অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান (১৯৫২), ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি (১৯৫৩), ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন (১৯৫৪), একমাত্র ধর্ম (১৯৫৩), ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ (১৯৫৫), ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি (১৯৫৫), কাদিয়ানী সমস্যা (১৯৫৪), ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (১৯৬০), তাফহীমুল কোরআন (১৯ খণ্ডে সম্পূর্ণ) ১ম পারা (১৯৫৮), সমাজ গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা (১৯৭৭), ইসলাম ও জাহিলিয়াত (১৯৫৫), ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ (১৯৫৭), হযরত মুহাম্মদের রাষ্ট্রব্যবস্থা; দীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, মুসলিম জাতির উত্থান-পতন ও পুনরুত্থান (অপ্রকাশিত); কিতাবুত তাওহীদ (অপ্রকাশিত), ইসলামের যাকাত বিধান ১ম খণ্ড (১৯৮২), ২য় খণ্ড (১৯৮৩), ইসলামের হালাল হারামের বিধান (১৯৮৪), বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত, ইমাম খোমেনীর আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া ও আল জিহাদুল আকবর।

পাণ্ডুলিপি : শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জাতি ও জাতীয়তাবাদ, অপরাধ দমনে ইসলাম, ইসলামী আইনের উৎস, সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, শ্রম ও শান্তি, দাসপ্রথা ও ইসলাম, উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর সমাজদর্শন। এ ছাড়া অন্যান্য আরও ১০/১২টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যার মধ্যে দুটো উপন্যাসও আছে।[১]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ছিলেন এই উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম বীরসেনানী, বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও দার্শনিক, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশে ইসলামী গণবিপ্লবের প্রবক্তা। তিনি একজন আলিম ও রাজনীতিক হিসাবেই বেশি খ্যাত। এমন মহৎ পুরুষের সন্ধান কমই দেখা যায়, যিনি একটি আদর্শ সমাজ গঠনের চিন্তাগত উপায়-উপকরণ ও এ জন্যে দর্শন পেশ করার সাথে সাথে নিজেও এ জন্যে প্রত্যক্ষভাবে ময়দানে কাজ করার সুযোগ পান। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম একদিকে এ উদ্দেশ্যে কলমের জিহাদ চালিয়ে গেছেন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্যে যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, অপরদিকে কর্মীদের সাথে সরাসরি ময়দানে নেমেও কাজ করেছেন। তিনি ইসলামকে গতানুগতিক 'ধর্ম' মনে করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় জ্ঞান আধুনিক সভ্যতা ও প্রগতির পরিপন্থী নয়। তাই তাঁর মৌলিক রচনা কিংবা অনূদিত গ্রন্থাবলী দল-মত নির্বিশেষে সকল মহলের নিকট গ্রহণীয় হয়েছিল। আধুনিক যুগের বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসার জওয়াব ও জটিলতার সমাধান তিনি এতটাই রাস্তবসম্মত উপায়ে দিতে পারতেন যে, তা একাধারে আদর্শিক মন ও আধুনিক মানসিকতার নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত। তাঁর অসংখ্য গবেষণাধর্মী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় এরই প্রতিফলন ও প্রতিচ্ছবি দেদীপ্যমান। তিনি সত্য দর্শন, আদর্শবাদিতা, মানসিক দৃঢ়তা ও আপোসহীনতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত জাতির সামনে রেখে গেছেন।

---

[১] *মাওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩২; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৮৯; *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আতহার আলী

(১৮৯১- ১৯৭৬)

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা আতহার আলী ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার থানার গোঙ্গাদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী আবদুল আজীম।

মাওলানা আতহার আলী নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন ভারতের মুরাদাবাদ কাসেমিয়া মাদরাসায়। পরে ভারতের রামপুর মাদরাসায় বিভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন।[১]

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে অবদান

মাওলানা আতহার আলী স্বদেশ ফিরে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কুমিল্লার জামেয়া-এ-মিল্লিয়া মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর প্রথমে হায়বতনগর এবং পরে ১৯০৯ সালে কিশোরগঞ্জ ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদে ইমাম নিযুক্ত হন। পাশাপাশি তিনি কুসংস্কার, শিরক-বিদ্'আত এবং অপসংস্কৃতির ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক করতে থাকেন। তিনি মানুষকে নসীহতের মাধ্যমে ধর্মপরায়ণ করে তোলা এবং সর্বত্র মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেন।[২]

রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ

বৃটিশ শাসিত উপমহাদেশে যখন মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসে, তখন মাওলানা আতহার আলী রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। সিলেট ও সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তানভুক্তির প্রশ্নে অনুষ্ঠিত গণভোটে তিনি বিরাট ভূমিকা রাখেন। সিলেটে জমিয়তে ওলামা-এ-হিন্দের প্রভাব বেশী থাকায় মাওলানা আতহার আলী আশংকা করছিলেন যে, তাঁর জন্মভূমি সিলেট জেলা যাতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেজন্য তিনি সিলেট গণভোটে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেন এবং এজন্য জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের পাকিস্তান সমর্থক খ্যাতনামা আলিমদেরকেও সিলেটে নিয়ে সভা-সমিতি করেন।[৩]

মাওলানা আতহার আলী সাধারণ আলিমদেরকে ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য সর্বপ্রথম 'ইসলামী শাসন কেন চাই' শিরোনামে একখানা বই লিখেন। তাঁর পুস্তকে উদ্ধৃত কুর'আনের ৩টি আয়াত ইসলামী রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান ও আলিমদের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। আয়াত তিনটি ছিল এই-

ومن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

---

[১] *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২২৪-২২৫; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[২] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-২৬৫।

[৩] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

"যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক জনগণকে শাসন করে না তারা ফাসিক।"[১]

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

"যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক জনগণকে শাসন করে না তারা যালিম।"[২]

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক শাসন করে না তারা কাফের।"[৩]

পরবর্তীতে তাঁর লিখিত 'নেজামে ইসলামের আলোতে' এবং 'ইসলামী জীবন দর্শন'- এ দুটি পুস্তক ইসলামী রাজনীতির গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।[৪]

465079

ওলামা ঐক্য সৃষ্টিতে মাওলানা আতহার

মাওলানা আতহার আলীর আন্দোলন বহুধাবিভক্ত আলিমদেকে এক কাতারে আনতে সক্ষম হয়েছিল। সে সময় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণসমূহের মাধ্যমে দেশের পার্লামেন্টের সাথে আলিমদের কি সম্পর্ক তা বুঝাতে পেরেছিলেন। ছোটখাটো ধর্মীয় বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও বাংলার আলিম সমাজ মাওলানা আতহার আলীর নেতৃত্বে যাবতীয় অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এ দেশের এমন কোন জেলা, মহকুমা শহর ছিল না, যেখানে মাওলানা আহতার আলী ঝটিকা সফর করে সভা-সম্মেলন করেননি। তিনি দেশের বিভিন্ন মত ও পথের বড় বড় মাদরাসায় গিয়ে ঐক্য ও ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে বক্তৃতা দিতেন। ৫০-এর দশকের শুরুতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ওলামা কনভেনশনে তাঁর প্রদত্ত লিখিত ভাষণে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি উক্ত ভাষণে আলিম সমাজকে ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন-

"যে সমস্ত মহানুভব বন্ধু মাদ্রাসা, মসজিদ এবং খানকাসমূহের আবেষ্টনীতে থাকিয়া ইসলামের মহান খেদমত আনজাম দিতেছেন, জাতির এ দুর্দিনে কওম ও মিল্লাতের এজতেমায়ী খেদমত ও সংঘবদ্ধ সংগ্রামে পূর্ণ অংশগ্রহণ করা তাঁহাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সমস্ত বিরোধী শক্তি ইসলামী শাসনতন্ত্রের পথ রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্যে সংঘবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের প্রচেষ্টা সফলকাম হইলে সর্বপ্রথম তাহারা ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলিকেই ধ্বংস করিবে এবং বাছিয়া বাছিয়া তাহারা ইসলামের পতাকাধারীদেরকেই খতম করিবে। সুতরাং ইসলামী শিক্ষা, মসজিদ ও মাদ্রাসার সহিত যদি আপনাদের দিলী মহব্বত থাকে, প্রাণের আকর্ষণ থাকে, ইহাদের ভবিষ্যত যদি আপনারা উজ্জ্বল করিতে চান, তবে সর্বপ্রথম আপনাদেরকে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাস করাইবার সংগ্রামে পূর্ণ আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে এই দাবীকে গণদাবীতে পরিণত করিতে হইবে। ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে এমন গণ আওয়াজ উঠাইতে হইবে, যাহার সামনে সকল বিরোধী আওয়াজ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া যায় এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরা সাহস হারাইয়া ফেলে।"[৫]

---

[১] আল-কুর'আন, সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪৭।

[২] আল-কুর'আন, সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪৫।

[৩] আল-কুর'আন, সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪৪।

[৪] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮।

[৫] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের সভাপতি

শর্ষিণার পীর মাওলানা নিসারউদ্দীন ছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের সভাপতি। তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার দরুন কর্মদক্ষতা হারিয়ে ফেলায় জমিয়তের কার্যকরী সভাপতি হিসেবে মাওলানা আতহার আলী নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনিই জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত হন।[১]

পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক কনফারেন্স

১৯৫১ সালে করাচী সম্মেলনে সর্বদলীয় ওলামা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি তৎকালীন পাকিস্তানের মন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হাতে অর্পণ করা হয়। সমগ্র পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবীকে আরও জোরদার করতে দেশের উভয় অঞ্চলে বড় বড় সভা-সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৩ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন এর মন্ত্রীসভার আমলে মাওলানা আতহার, মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ প্রমুখ ওলামার উদ্যোগে ঢাকার পল্টন ময়দানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে দু'দিন ব্যাপী ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২]

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী

মাওলানা আতহার আলী বলতেন, কুর'আন মজীদের সূরাহ ইবরাহীমের একটি আয়াতে মাতৃভাষার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাতে বলা হয়েছে, "আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছি, যেন সে এর মাধ্যমে আমার বাণী মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে।" তাই মাওলানা আতহার আলী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়েছিলেন।[৩]

'নেজামে ইসলাম পার্টি' গঠন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ

সে সময় সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মাওলানা ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ ও মাওলানা আতহার আলীর নেজামে ইসলাম পার্টিই উল্লেখযোগ্য বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দল ছিল। এ বিরোধী দলসমূহকে নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে 'এ কে ফজলুল হক-মাওলানা আতহার আলী-মাওলানা ভাসানী যুক্ত ফ্রন্টের' বিজয় হয়। মাওলানা আতহার আলী কিশোরগঞ্জ থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টিতে নেজামে ইসলামের সদস্যসংখ্যা ছিল ২৭ এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে তা ছিল ৪। তথাপি নেজামে ইসলাম পার্টি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনায় এবং প্রাদেশিক পরিষদে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের নামকরণ করা হয় ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান।'[৪]

পার্লামেন্টে মাওলানা আতহার

একজন নিঃস্বার্থ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী হিসেবে মাওলানা আতহার আলীর বক্তব্যের একটি আলাদা প্রভাব ছিল। ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে মাওলানা আতহার আলী তৎকালীন পূর্ব

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদে মদ, জুয়া ও বেশ্যাবৃত্তি উচ্ছেদের জন্যে প্রস্তাব এনেছিলেন। তখন শ্রী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ীর নেতৃত্বে একদল হিন্দু এমপি তাঁর এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।[১]

একটি মহান পদক্ষেপ : জামেয়া-এ-এমদাদিয়া

মাওলানা আতহার আলী ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জে 'জামেয়া-এ-এমদাদিয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মাওলানা আতহার আলী জানতেন, মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরনির্ভর হলে ইসলামের যথার্থ সেবা দেয়া যায় না। তাই তিনি স্বাবলম্বী জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগী শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন।[২]

ইন্তেকাল

মাওলানা আতহার আলী ১৯৭৬ সালের ৬ই অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। জামেয়া ইসলামিয়া মোমেনশাহীর সম্মুখস্থ মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে তাঁকে কবর দেয়া হয়।[৩]

মাওলানা আতহার আলী ছিলেন বাংলাদেশের ওলামা জাগরণ ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, আপোসহীন নিঃস্বার্থ সংগ্রামী নেতা, যোগ্য সংগঠক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন, অনৈসলামিক কার্যকলাপ উৎখাতে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ, বহু মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, ওয়াজ-নসীহত, কুর'আন-সুন্নাহ শিক্ষাদান, ইসলাম ও দেশের স্বার্থে তাঁর গৃহীত বিভিন্ন কাযাবলী এবং ওলামা ঐক্যের প্রচেষ্টা এ দেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

[২] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

[৩] *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ

[১৯০০-১৯৭৪]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষের আদিবাস ছিল সীমান্তপ্রদেশের (পাকিস্তান) রাজুড় এলাকায়। তাঁর পিতা নুরুল্লাহ্ খাঁ ছিলেন বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ক্যাপটেন।[১]

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে হাদীসের 'সিহাহ সিত্তাহ্' পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন তৎকালীন চকবাজার জামে মসজিদে অবস্থানরত মাওলানা ইবরাহীম পেশোয়ারীর নিকট। অতঃপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৫ সালে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে ৫ বছর ফিকাহ, হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দিল্লীর আমিনিয়া মাদরাসায়ও অধ্যয়ন করেছেন। শিক্ষা শেষে তিনি ১৯২১ সালে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

কর্মজীবন

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁর কর্মজীবনের ব্যপ্তি ছিল অর্ধশতাব্দী কাল পর্যন্ত। এ বিস্তৃত সময়ের মধ্যে তিনি অধ্যাপনা এবং সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ঢাকার প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাম্মাদিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। মাদরাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের প্রায় এক যুগ অতিবাহিত হয়। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি একজন সুবক্তা হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেন। ঢাকা শহরে উর্দু ভাষার প্রচলন অধিক ছিল বলে মুফতী সাহেব এখানকার অধিকাংশ সভা-সমিতিতে উর্দুতেই বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর উর্দু বক্তৃতা একজন দক্ষ উর্দু ভাষাভাষীত বক্তার মতোই গতিশীল ও আকর্ষণীয় ছিল। তিনি কয়েক বছর শিক্ষকতায় বিরতি দিয়ে বার্মায় ওয়ায-নসীহত, কুর'আন তাফসীর এবং ইসলামী শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি প্রায় বার বছর বার্মায় ইসলাম প্রচার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪১ সালে মুফতী সাহেব বার্মা থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৫০ সালে লালবাগ জামেয়া-এ-কোরআনিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি সেখানে শিক্ষকতা করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারীও ছিলেন।[৩]

---

[১] এসরার আহমদ, *মুফতী দীন মোহাম্মদ খান*, ১১/৩, এ. সি. রায়. রোড, ঢাকা, তারিখবিহীন, পৃ. ১-৬; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫; *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০; *আমরা যাদের উওরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

[২] *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; *মুফতী দীন মোহাম্মদ খান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-১২; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬; *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ৯২।

[৩] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২-৩৩৩; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৮; *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২১; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*,

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর মাহফিলের প্রতি গুরুত্ব দান

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ ঢাকায় খ্যাতি লাভ করেন তাঁর কুর'আন তাফসীরের মাধ্যমে। একজন দক্ষ মুফাস্সির-এ-কুর'আন হিসেবেই তিনি দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেন। বার্মাতে বাঙ্গালী জামে মসজিদে মুফতী ও খতীব হয়ে তিনি একাধিকবার গোটা কুর'আনের তাফসীর বয়ান করেন। ১৯৪১ সালে ঢাকায় এসেও তিনি ঢাকার চকবাজার মসজিদে প্রত্যহ বাদ-এশা নিয়মিত কুর'আনের তাফসীর করেন। তাঁর ঢাকার তাফসীর মাহফিলে অসংখ্য লোকের সমাগম হত।

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে "কুর'আন-এ-হাকীম ও হামারী জিন্দেগী" এ শিরোনামে দীর্ঘদিন যাবত কুর'আন মজীদের তাফসীর করেছেন। তিনি তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে কুর'আনের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ককে নিবিড় করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি অনেক মুফাস্সির সৃষ্টির পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রমযান মাসে ফাযিল, কামিল ও দাওরা-এ-হাদীস পাস ছাত্রদের জন্যে এক মাসের একটি তাফসীর শিক্ষা কোর্সের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি নিজ পকেট থেকে তাফসীর কোর্সে অংশগ্রহণকারীদেরকে ভাতা দিতেন। উল্লেখ্য, মুফতী সাহেব একজন স্বাবলম্বী বিত্তশালী আলিম ছিলেন। কোন আলিমের হাত 'দাতার হাত' না হয়ে 'গ্রহীতার হাত' হওয়াকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁর এ তাফসীর ক্লাসের দ্বারা পান্ডিত্য অর্জন করে বহু নবীন আলিম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ তাফসীর মাহফিল ও বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে কুর'আনের খেদমতের রীতি আমৃত্যু চালু রেখেছিলেন।[১]

সংস্কারমূলক কাজ

সমাজে ধর্মের নামে কুসংস্কারের অন্ত নেই। মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ যে সময় কর্মজীবনে পদার্পণ করেন, তখন শিরক-বিদ'আত ও অপসংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল অত্যন্ত বেশি। পীরপূজা, কবর পূজা, রবিউল আওয়াল ও শবেবরাত উপলক্ষে আতশবাজি পোড়ানো, মীলাদ মাহফিলের মধ্য দিয়ে শিরক ও বিদ'আতী কাজ-কর্মের অনেক দৌরাত্ম ছিল। মীলাদের নামে যা কিছু হতো, তাতে মহানবীর জীবনের মূল শিক্ষা ও আদর্শ বর্ণনার চাইতে অনেক অপ্রামাণ্য বিষয় বর্ণিত হতো বা কেবল দরূদ-সালাম ও কিছু কাসীদা পাঠ অথবা কাওয়ালী অনুষ্ঠান দ্বারা 'সওয়াব হাসিলের' মহৎ কাজ সম্পন্ন হতো। মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ ধর্মীয় পোশাকে মুসলিম জীবনধারায় যেসব কুপ্রথা ও অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করেছিল, ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে সেগুলোর উচ্ছেদে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি সীরাতুন্নবী জলসার প্রবর্তন করে সমাজে স্বার্থক মৌলুদ পদ্ধতির প্রচলন করলেন। তাঁর তাফসীর মাহফিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে সীরাত মাহফিলের প্রবর্তন এখানকার ধর্মীয় জীবনধারায় নূতন প্রাণের সঞ্চার করে।

ঢাকার অসংখ্য কুপ্রথার মাঝে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জুয়া খেলা ছিল একটি। মুফতী দীন মুহাম্মদ একটি মসজিদে জুয়া সংক্রান্ত আয়াতের তাফসীর করার সময় ঘোড়দৌড় বাজির পরিণতি বর্ণনা করলে এ কাজে জড়িতরা তাদের জুয়ার ঘোড়া বিক্রি করে দেয়। রেইস কোর্স ময়দানে জুয়ার ঘোড়ার রেইস বন্ধে মুফতী সাহেবের বিরাট অবদান ছিল।[২]

প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০; *মুফতী দীন মোহাম্মদ খান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১১।

[১] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯।

[২] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্পষ্টবাদিতা

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ ছিলেন প্রখ্যাত আলিম ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তাই তিনি মাঝে মাঝে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখতেন। তিনি সাধারণত রাজনৈতিক বক্তব্য বেশি দিতেন না এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জীবনের শেষের দিকে তেমন সক্রিয়ভাবে জড়িতও ছিলেন না। কিন্তু যখন জাতীয় পর্যায়ে কোন বড় রকমের ওলট-পালট হবার আশংকা করতেন, তখন তিনি জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে কোন রাজনৈতিক বলিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করতেন। তিনি কারও রক্তচক্ষুর পরোয়া করতেন না কিংবা অন্ধভাবে কোন ভ্রান্ত পথেরও অনুসরণ করতেন না। তাঁর এই বলিষ্ঠ নীতির স্বাক্ষর দেখা যায় পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এবং স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় দেশের প্রায় শতকরা ৯৫ জন লোক পাকিস্তানের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এদেশের কিছু আলিম সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে নিছক ওস্তাদভক্তির কারণে কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত সমর্থক হিন্দুস্তানের কিছু আলিমকে খুশি করতে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন, তখন মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ নির্ভীক কণ্ঠে পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠিত না হলে পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদেরকে হিন্দু ভারতের দাসত্ব করতে হবে।[১]

ইখতেলাফের প্রতি ঘৃণা

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ অযৌক্তিক মতবিরোধ পছন্দ করতেন না। জাতি-ধর্মের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি সব আলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানাতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকাতে ইসলামী আন্দোলনের যেসব যৌথ কর্মসূচী গৃহীত হতো, তাতে দলীয় কোন সংকীর্ণতা দেখলে তিনি তীব্রভাবে তার বিরোধিতা করতেন। যতবড় লোকই হোক না কেন কারোর মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে তা তিনি তার প্রতি দৃষ্টি গোচর করতেন।[২]

গ্রন্থ রচনায় অবদান

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্যের জগতে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। 'তাফসীরে সূরা ইউসুফ' শীর্ষক গ্রন্থটি তাঁর মূল্যবান রচনা। এছাড়া কুর'আনের বিভিন্ন কাহিনী সম্পর্কেও 'আহসানুল কাসাস' নামে উর্দুতে একটি কিতাব আছে। ১৯৮৩ সালে 'কুর'আনের সুন্দরতম কাহিনী' নামে ঐ কিতাবের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'মুশকিল আসান' নামেও দু'আ-দরূদ সংবলিত তাঁর আরো একটি জনপ্রিয় কিতাব রয়েছে। ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতামালা- "কুর'আনে হাকীম ও হামারী জিন্দেগী"-এর পাণ্ডুলিপি তাঁর পরিবারের হাতে বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুলিপিটি বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করা হলে ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

[৩] *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ জীবনের অবদান

স্বাধীনতাত্তোর কালে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। দেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার মতো তখন তেমন কোন নির্ভীক ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছিল না। এ গুরুদায়িত্ব হাতে নেয়ার জন্য সব মহল থেকে মুফতী সাহেবের প্রতি দাবি আসতে লাগল। মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ এদেশের ইসলামী জনতার আন্তরিক ডাকে সাড়া দিলেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হলো স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় সীরাত কমিটি। এর দেখাদেখি সারা দেশের জেলা, মহকুমা, থানা সহ প্রত্যন্ত এলাকায় সীরাত কমিটি গঠিত হতে থাকে এবং ঐ সব কমিটির মাধ্যমে সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১]

ইন্তেকাল

মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ ১৯৭৪ সালের ২রা ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। তাঁকে ঢাকার লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে কবর দেয়া হয়।[২]

ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে মাদরাসায় শিক্ষকতা করা, তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে আল-কুর'আনের সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলা, ইসলামী গ্রন্থ রচনা, কুসংস্কার রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও সীরাত কমিটি গঠন ইত্যাদি মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।

---

[১] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

[২] *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১; *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী

[১৯৩৫-১৯৭৮]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী ১৯৩৫ সনের ৩১ শে মার্চ ফরিদপুর জেলার কালকিনি থানার সাহেব রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুনশী আবদুল করিম।[১]

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীন ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত আলিম ও ১৯৪৯ সালে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৯৫১ সালে উক্ত বোর্ডের অধীন কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে 'উলূমুদ্দীন অনুষদ থেকে ১৯৫৩ সালে প্রথম বিভাগে আলামিয়া ডিপ্লোমা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কায়রোস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে' ভর্তি হন এবং ১৯৫৫ সালে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকালটি অব শরইয়াহ (ইসলামী আইন) বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে উক্ত বিষয়ে অনার্স সহ আলামিয়া ডিগ্রী লাভ করেন।[২]

কর্মজীবন

শিক্ষাশেষে মাওলানা আযহারী আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউটে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। দু' বছর চাকুরী করার পর ১৯৫৮ সনে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে বাংলা একাডেমী (ঢাকা) এর অনুবাদ বিভাগে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৫৯ সনে ঢাকার সরকারী মাদরাসা ই-আলীয়া-য় আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। উক্ত মাদরাসার এডিশনাল হেড মাওলানা পদে উন্নীত হন। ইন্তে কালের (১৯৭৮ খ্রী.) পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ইনস্টিটিউটের খণ্ডকালীন লেকচারার পদে নিয়োজিত ছিলেন।[৩]

গ্রন্থ রচনায় অবদান

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী বেশ কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। প্রথম পুস্তক The theory and sourecs of Islamic Law for non-Muslem (১৯৬১ সালে মাদরাসা-ই-আলীয়া কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়)। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে : (১) 'আরবী বাংলা অভিধান (৫ খণ্ডে সমাপ্ত), (২) বাংলা আরবী অভিধান (২য় খণ্ড), (৩) তাজরীদ আলবুখারী (২য় খণ্ড), (৪) আল-আযহারের ইতিহাস, (৫) কোরআন ও বিজ্ঞান, (৬) ইসলামের ইতিহাস (৭ খণ্ডে), (৭) উর্দু বাংলা অভিধান, (৮) তাফসিরে আযহারী, (৯) আল-আদাবুল আসরী, (১০) আল-ইনশাউল আসরী, (১১) সহজ আরবী শিক্ষা। তিনি 'আলসাকাফা' নামে একটি মাসিক আরবী পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৪]

---

[১] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২-২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দেশ সফর ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দে অনুষ্ঠিত বিশ্বমুসলিম শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে যোগদান করেন এবং লেনিনগ্রাডের চাবি উপহার পান। তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য এবং বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃসমিতি ও বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি মজলিসের সভাপতি। তিনি সঊদী আরব, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া, আরব আমীরাত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের বহু দেশ সফর করেন।[১]

ইন্তেকাল

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী ১৯৭৮ সনের ২৭শে মার্চ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। মগবাজার কাজী অফিস লেনস্থ স্বীয় বাসভবনের পার্শ্বেই তাঁকে দাফন করা হয়।[২]

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী তাঁর অনন্য অবদান। যা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী

[১৯০৩-১৯৮৪]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী ১৯০৩ সালে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেরানির হাটে জন্মলাভ করেন। তিনি কলকাতা আলীয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

মাওলানা ওবায়দুল হক মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার সাক্ষ্য হচ্ছে আজকের ফেনী আলীয়া মাদরাসা।[১]

জমিয়াতুল মুদাররিসীন ও মাওলানা

মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী ছিলেন আধুনিক চিন্তাধারার লোক। তিনি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযুগী করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে মাদরাসাপাস ছাত্ররা একদিকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুগজিজ্ঞাসার জবাব দানে সক্ষম হয় এবং অপরদিকে সমাজজীবনের বৃহত্তর অঙ্গনেও অবদান রাখতে পারে। আলীয়া পদ্ধতির মাদরাসাসমূহে সর্বপ্রথম বাংলা পাঠ্যভুক্তকরণের দাবী উত্থাপনকারী মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর সাথে একত্মতা ঘোষণা করে মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হন। মাওলানা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলা-আসামের বিশাল এলাকায় মাদরাসা শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন একক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই অবিভক্ত বাংলা এবং আসামের সকল মাদরাসার শিক্ষকদের নিয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। আর গঠন করলেন মাদরাসা শিক্ষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন জমিয়াতুল মুদাররিসীন। এই জমিয়ত গঠন করে দল-মত-নির্বিশেষে সকল মাদরাসা শিক্ষককে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি তাঁর উদারতা, সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, খোদাভীরুতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতার দ্বারা মাদরাসার ওলামাদের একই প্লাটফরমে সমবেত করতে পেরেছিলেন। আজকের জমিয়াতুল মুদাররিসীন সংগঠনটি মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবেরই অকৃত্রিম প্রচেষ্টার সাক্ষর।[২]

রচনাবলী

মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামীবাদীর উল্লেখযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থ হচ্ছে 'তাযকিরা-এ-আওলিয়া-এ-বাঙ্গালা'।[৩] এটি ১৯৩১ সালে উর্দু ভাষায় রচিত হয়। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক নাম 'তারীখুল হক'। গ্রন্থটি নোয়াখালির ফেনীস্থ হামিদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এতে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে বাংলাদেশের ৭৪ জন ওলীর জীবনী স্থান পেয়েছে।[৪]

---

১ *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭-২৬৮।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০।

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১-২৭২।

৪ *বাংলাদেশে আরবী, ফারসী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল

মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী ১৯৮৪ সালের ১৫ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন ।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিম অধ্যক্ষ মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামাবাদী ছিলেন বহুমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন এক বুজর্গ আলিম । তাঁর জীবনে যেসব মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, তাঁর দৃষ্টান্ত আজকাল অতি বিরল । তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ, ইসলামী শিক্ষার প্রসারদাতা, সূফী প্রকৃতির বিচক্ষণ আলিম, মুহাদ্দিস, পীর, লেখক, সংবাদপত্রসেবী, সাহিত্যামোদী, দূরদর্শী সংগঠক, সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ । দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শিক্ষার উন্নতি ও বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন মতের আলিমদের ঐক্যবদ্ধকরণের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর রয়েছে উজ্জ্বল অবদান । ফেনী আলীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, মাদরাসা শিক্ষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন জমিয়াতুল মুদাররিসীন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল মজিদ খাঁ

[মৃত্যু ২৭ শে মার্চ ১৯৭৫]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

আবদুল মজিদ খাঁ মোমেনশাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর দারুল উলূম দেওবন্দে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞানলাভ করেন।[১]

রাজনীতি

দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষা শেষে মাওলানা আবদুল মজিদ খাঁ জমিয়তে ওলামা-ই-হিন্দের সদস্যভুক্ত হন। এ সময় ভারত-বিভাগের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে।[২]

পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৫৩ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে যে সর্বদলীয় ওলামা করফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় মাওলানা আবদুল মজিদ তার ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। বস্তুত ঐ সময়ই তাঁর সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শীতার পরিচয় পাওয়া যায়।[৩]

মাওলানা আবদুল মজিদ খাঁ জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ পার্টির অন্যতম তাত্ত্বিক ও নীতিনির্ধারক সদস্যরূপে গণ্য হন। তিনি জীবনের শেষ দিকে বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন।

ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বারোপ

পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের শুরুর দিকে দেশের আলিম সমাজকে রাজনীতিতে নামানো সহজ ব্যাপার ছিল না। কেননা অধিকাংশ আলিমের নিকট রাজনীতি ছিল অবৈধ। সে সময় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে যে দু'চারখানা বই-সাময়িক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো পাঠে রাজনীতির ব্যাপার দ্বিধাগ্রস্ত অনেক আলিমই বিভ্রান্তিমুক্ত হয়েছিলেন। ঐ সব লেখা ও প্রশানায় মাওলানা আবদুল মজিদের যথেষ্ট অবদান ছিল। মাওলানা মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ও পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লেখার ব্যাপারে আলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করতেন। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির প্রচার বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালে দেশে ব্যাপক ইসলামী সাহিত্য বিকাশের উদ্দেশ্যে পার্টির প্রকাশনা বিভাগের সঙ্গে একটি ইসলামী গবেষণাগার স্থাপনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। মাওলানা আবদুল মজিদ খাঁ আফসোস করে বলতেন, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মনে যেসব প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠে, সে সব প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দানে আলিমগণ ব্যর্থ হলে ঐ সব যুবক তাঁদের প্রতি আস্থাহারা হয়ে পড়বে এবং তারা ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য তন্ত্রমন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বে। তাই সর্বদা মাওলানা আবদুল মজিদ খাঁ ইসলামী

---

[১] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করতেন।[১]

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির অধীনে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন এবং ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রতি যথাযথ গুরুত্বদান ও এ জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা মাওলানা আবদুল মজিদ খাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহ্‌মদ

[১৯০৫ -১৯৮৭]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত বরইতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওয়াজিউল্লাহ। তিনি স্থানীয় শাহারাবিল আনওয়ারুল উলূম মাদরাসায় প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদরাসায় মেশকাত ও জালালাইন জামাত সমাপ্ত করে দাওরা-এ-হাদীস পড়ার জন্যে দারুল উলূম দেওবন্দ গিয়ে ভর্তি হন। দারুল উলূম দেওবন্দে থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ২৭ বছর পটিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১]

রাজনীতি ও অবদান

মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাওলানা আতহার আলীর আহ্বানে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ সময় দেশে প্রচলিত বিভিন্ন বিদ'আত, শিরক, কবরপূজা, পীরপূজা ইত্যাদি অপসংস্কৃতি দূরীকরণে ভূমিকা রাখেন। শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত সুবিধাবাদী পীর-ফকীরদের দ্বারা ইসলামের মূল শিক্ষা-আদর্শ মুছে যাবার উপক্রম হলে মুফতী এ-আযম ফয়েজুল্লাহ্‌র শুরু করা সংস্কার আন্দোলনকে তিনি সফলতার সাথে এগিয়ে নেন।[২]

ইসলামী শিক্ষার খেদমত এবং কুসংস্কার উচ্ছেদ ছাড়াও মাওলানা সিদ্দীক আহমদ আধুনিক সভ্যতা ও আধুনিক জাহিলিয়্যাত থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী চ্যালেঞ্জের বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলায় বিরাট ভূমিকা রাখেন। তিনি ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা আধুনিক জিজ্ঞাসা ও চ্যালেঞ্জের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।

মাওলানা সিদ্দীক আহমদের সংস্কার আন্দোলনের ফলে দেশের ওলামা-ই-কিরামও নতুন ভাবে আত্মচেতনা ফিরে পান। সে সময় মাদরাসাগুলোতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম ছিল উর্দু। দেশে তখন আলিমের অস্তিত্ব থাকলেও অনেকেই বাংলা চর্চা করতেন না। মাওলানা সিদ্দীক আহমদ আরবী এবং উর্দু ভাষার একজন সুপণ্ডিত বক্তা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি অন্যান্য আলিমদেরকে বাংলা বলতে উদ্বুদ্ধ করতেন।[৩]

বাংলাদেশ স্বাধীনত হবার পর মাওলানা সিদ্দীক আহমদ গ্রেফতার হন। পরে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পান। ১৯৭৫ সালে নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, খেলাফতে রব্বানী প্রভৃতি ৫টি সংগঠনের জনগণের উদ্যোগে ইসলামী ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে

---

[১] *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬-২৬৭; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

[২] *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-৩১২; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭-২৬৮।

[৩] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

খতীবে আযমকে নেতা নির্ধারণ করে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) গঠিত হয়। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে আইডিএল (ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ)-এর পক্ষ থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ১৯৮৭ সালে একটি সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। তখন এ সংগঠন থেকে ৬ জন প্রার্থী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।[১]

মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ইলমে দীনের প্রসার, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং অপসংস্কৃতি ও ভ্রান্ত মতাদর্শের যুক্তি খণ্ডনের মধ্য দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে যে অবদান রেখে গেছেন, তা এদেশের ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে ভবিষ্যত কর্মীদের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।[২]

গ্রন্থ রচনায় অবদান

মাওলানা সিদ্দীক আহমদের লিখিত পুস্তকাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুস্তক হলো-

১। মাদরাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশ ধারা ২। আলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩। খতমে নবুওয়ত, ৪। শানে নবুয়ত (৮ খণ্ডে), ৫। মেরাজুন্নবী (স), ৬। মাওয়াজে খতীবে আযম (১ম ও ২য় খণ্ড), ৭। সাংবাদিক সাক্ষাতকার।[৩]

ইন্তেকাল

মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ১৯৮৭ সালের ১৮ই মে নিজ গ্রামে ইন্তেকাল করেন।[৪]

মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ছিলেন ইসলাম ও মুসলিম জাতির মহান খাদিম। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, অপসংস্কৃতি ও ভ্রান্ত মতাদর্শের যুক্তি খণ্ডনের মধ্য দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা, দীর্ঘ ২৭ বছর পটিয়া মাদরাসার হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে গ্রন্থাবলী রচনা প্রভৃতি তাঁর মূল্যবান অবদান।

---

[১] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮-২৬৯; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

[২] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

[৩] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

[৪] *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯; *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান

[১৯০০ - ১৯৭৫]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা মোখলেসুর রহমান ১৯০০ সালে বৃহত্তম নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলাধীন কামালপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মুহাম্মদ ইসমাঈল। লাকসাম উপজেলার উত্তর হাওলার লচ্চর নামক গ্রামে মোখলেসুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় ছিল আলিম পরিবারের মানুষ। অতঃপর তিনি কুমিল্লা হুস্সামিয়া মাদরাসায় পড়ালেখা করেন।

কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে কারারুদ্ধ ছিলেন। পুনরায় ১৯২৬ সালে তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি স্থানীয় প্রশাসনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে নিরপেক্ষ প্রার্থীরূপে তিনি সাধারণ নির্বাচন সমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪১ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বসবাস করেন। সেখানে তাঁর বড় ব্যবসা ছিল। ব্যবসায়ের অর্থলব্ধ টাকার বড় অংশ তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা-কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া এবং সভা-সিমিতির চাঁদা ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।[১]

উজ্জ্বলতর কীর্তি 'রহমতে আলম ইসলাম মিশন'

মাওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান ঢাকায় এমন একটি ইসলামী প্রচারকন্দ্রে গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন, যেখান থেকে আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করা এবং দেশ-বিদেশে ইসলামের আদর্শ প্রচার ও প্রসার করা ছাত্রদের জন্য অধিকতর সহজ হবে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূরণ করবে সৎ নেতৃত্বের অভাব। উক্ত প্রতষ্ঠান থেকে তিনি এমন সব ব্যক্তি তৈরি করতে চেয়েছেন, যাদের আদর্শ এবং প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সৌন্দর্য ও সেবাকর্মে আকৃষ্ট হয়ে অমুসলিমরাও ইসলামের ছায়াতলে আসবে। এ মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৬১ সালে তিনি তেজগাঁও ১ নং রেলগেইট সংলগ্ন একটি স্থানে ৫৬ শতক জমির উপর 'রহমতে আলম ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এর একটি শাখা টঙ্গীতে ৪৩ বিঘা জমির উপর স্থাপিত। এ মিশন যোগ্য ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা কমিটির দ্বারা পরিচালিত। এ মিশনের অধীনে আরো কতিপয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মাওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান তাঁর ইসলাম মিশনের সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি বিভাগ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(ক) মাদানীতুল উলূম সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা (বালক শাখা);

---

[১] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) মদীনাতুল উলূম সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা (মহিলা শাখা);

(গ) একটি ইয়াতীমখানা; এবং

(ঘ) হেফ্‌জখানা।[১]

ইন্তেকাল

মাওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান ১ লা আগস্ট ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[২]

মাওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান ছিলেন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসার-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক। তাঁর বড় অবদান হলো ১৯৬১ সালে ঢাকার তেজগাঁও ১ নং রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে ৫৬ শতক জমির উপর 'রহমতে আলম ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠা।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী

[১৯০০ - ১৯৭২]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ১৯০০ সালে (মতান্তরে ১৮৯৯ সালে) নোয়াখালীর ফেনীর সিলোনিয়া অঞ্চলের নিযামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ আলী আজম।[১] দাদা যফর আলী ভারতের আজমগড়ের ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান দারুল মুসান্নেফীন আজমগড়-এর ভাবাদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সে কারণে অথবা তাঁর পিতার নামানুসারে তিনি আজমী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২]

মাওলানা নূর মোহাম্মদ তাঁর নানা মুনশী মুহাম্মদ হাতিমের নিকট কুর'আন ও ফার্সী বই অধ্যয়ন করেন। ১৯১৪-১৫ সালে তিনি নিজ গ্রামের নৈশ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে দাগন ভূঞা আযীযিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং তিন বছর আরবী-ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে দারুল উলূম-এ জামাআত-এ-চাহারম-এ ভর্তি হন এবং ১৯২৫ সালে উক্ত মাদরাসা থেকে 'জামাআত'-এ উলা (ফাযিল) পাস করেন।[৩]

'প্রাচ্য বিদ্যাভাণ্ডারের জীবন্ত বিশ্বকোষ'

মাওলানা আজমী অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু গবেষক ছিলেন। তাঁর লিখিত কোন তত্ত্ব ও তথ্যে সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেক হলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী পণ্ডিত মরহুম শেখ আবদুর রহীম বা ডক্টর শহীদুল্লাহ কিংবা মাওলানা আকরাম খাঁ অথবা মাওলানা সামুসল হক ফরিদপুরী বা আলিয়া মাদরাসার আল্লামা কাশগরী অথবা মুফতী আমীমুল ইহসান প্রমুখ বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করে সন্দেহমুক্ত হতেন এবং কলম ধরতেন। এমনকি এ বিষয়ে তিনি পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মুহাম্মদ শফী কিংবা মাওলানা মওদূদী অথবা দারুল উলূম দেওবন্দের ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সাথে তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন। এসব কারণেই তাঁর লেখা তত্ত্ব, যুক্তিপূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন হতো। যে-কোন সমস্যার যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক ইসলামী সমাধান দানে তাঁর দক্ষতা দেখে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ তাঁকে 'প্রাচ্য বিদ্যাভাণ্ডারের জীবন্ত বিশ্বকোষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।[৪]

---

[১] ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৪২।

[২] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪; *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

[৩] *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

[৪] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

মাওলানা নূর মোহাম্মদ শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯২৭ সালে প্রথমে চৌমুহনী মাদরাসায় এবং ১৯২৮-৪৩ সাল পর্যন্ত ফেনী আলিয়ায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা লাইব্রেরী ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন।[১]

ইসলামীত শিক্ষানীতির সংস্কার

মাওলানা আজমী মাদরাসা শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'মাদারিস-এ-আরাবিয়া-কা-নিযাম-এ-তালীম শীর্ষক ৪৮ পৃষ্ঠার একটি উর্দু পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেন এবং তা মাদরাসা সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত মুআযযম উদ্দীন কমিটি (১৯৪৬)-এর কাছে পেশ করেন। তাঁর সুপারিশে ১৯৪৬ সালে মাদরাসা পাঠ্যসূচীকে কিছুটা আধুনিক করা হয়। মাদরাসা শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি ১৯৩০ সালে 'জমইয়াতুল মুদাররিসীন' নামক শিক্ষক সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির মুখপত্র 'তালীম' নামক বাংলা পত্রিকা ফেনী থেকে প্রকাশ করেন।[২] মাদরাসা শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের ঢেউ যাতে উপমহাদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এ উদ্দেশ্যে মাওলানা আজমী তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাটি অবিভক্ত ভারতের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করেন। দেওবন্দ, সাহারানপুর, ডাবেল, নাদওয়া প্রভৃতি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের পণ্ডিতবর্গ তাঁর শিক্ষা-সংস্কারমূলক এ পুস্তকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৩]

রাজনীতিতে অবদান

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে না এলেও তিনি ছিলেন রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে অনেক রাজনীতিবিদ তাঁর কাছে এসে পরামর্শ নিতেন। (তৎকালীন আওয়ামী লীগের এমপি) খাজা আহমদ বলেন, "তাহার নীরব অথচ সচেতন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। রাজনীতির বহু কঠিন জটিলতার ব্যাপারে তাঁহার সাথে আমার আলোচনা হয়েছে এবং অনেক সময় তাঁহার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মতামত আমাকে চলার পথে সাহায্য করিয়াছে।"[৪]

গ্রন্থ রচনায় অবদান

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থাবলী-

১। 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস।' (হাদীস বিজ্ঞান ও ইতিহাস)।

২। খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

৩। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিকার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

৪। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ

৫। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা।

৬। ঈমান এবং আকীদা (অপ্রকাশিত)

---

[১] *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

[২] *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

[৩] *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-২২৩।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থ

৭। নেজামে তালীম (শিক্ষাপদ্ধতি) ১৯৪৬ সালে কলকাতা হতে বড় সাইজে প্রকাশিত হয়।

৮। আদাবে তরবিয়ত

৯। তালীকাত-এ-ওলামা-এ হিন্দ

আরবী ইংরেজী ভাষায় রচিত

১০। তারীখু ফনূনিত্তাফসীর (তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস)। এটি ২০৩ পৃষ্ঠা সংবলিত একটি আরবী পাণ্ডুলিপি। এতে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাড়ে নয়শো তাফসীর গ্রন্থের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

১১। New Arabic Word Book

১২। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ১৯৩৭ থেকে মাওলানা আজমী দৈনিক আজাদ ও নবযুগে লিখতে শুরু করেন। মাসিক মোহাম্মদী, মাহে নও, মাসিক মদিনা, পৃথিবী, ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, দিশারী, মিনার, জাহানে নও, ইনসাফ, সংগ্রাম প্রভৃতি দৈনিক, মাসিক ও সাময়িকীতে মাওলানা আজমীর বহু প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ঐগুলোর মোটামুটি তালিকা নিরূপ।

(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর আলেম সমাজ ও রাজনীতি;

(২) ভারতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন (মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৪০ খ্রী.);

(৩) ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার কথা (মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৫০ খ্রী.);

(৪) ফিলিস্তীনে ইহুদী (মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৫১ খ্রী.);

(৫) ইজতিহাদের আবশ্যকতা (মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৫৫ খ্রী.);

(৬) ইসলামে দরিদ্রের অধিকার (বিভিন্ন প্রত্র-পত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশিত);

(৭) আমাদের শিক্ষা সমস্যা ;

(৮) প্রবাদবাক্য;

(৯) একমাত্র পথ;

(১০) ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাতে পড়ার কারণ (১৯৬১ খ্রী.);

(১১) ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত (১৯৬১ আগস্ট);

(১২) ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ (১৯৬৩ খ্রী.);

(১৩) বাংলা সাহিত্যের উপর ইসলামের প্রভাব (১৯৬২ ফেব্রুয়ারী);

(১৪) মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়ন;

(১৫) পাক-ভারতে কোরআনের তাফসীর;

(১৬) বাংলা-ভারতে এলমে হাদীস;

(১৭) পাক-ভারত লিখিত হাদীসের কিতাব (১৯৬০);

(১৮) হযরত আবু হোরায়রা ও ইব্ন আব্বাস; এবং

(১৯) ইজতেহাদ (দিশারী ১৯৬৫ জানুয়ারী)।[১]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী বিবাহ করেননি। তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। তথাপি তিনি গবেষণার কাজ ছেড়ে দেননি। এ জ্ঞান তাপস ১৬ আগস্ট ১৯৭২ সালে মতান্তরে ১৯৭৩ সালে নিজামপুরে ইন্তেকাল করেন এবং পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত হন।[১]

বাংলাদেশের গৌরব জ্ঞানতাপস মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ছিলেন একাধারে ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক ও ভাষাবিদ। তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষানীতির সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক পুরোধা। ভাষা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এদেশের যুব-সমাজ, বিশেষ করে মাদরাসা পাস যুবক আলিমদের জন্য প্রেরণার উৎস। তিনি তাঁর পুরো জীবনটি জ্ঞানের সাধনায় উৎসর্গ করেছিলেন। কোন রকম অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে খাঁটি জ্ঞানের এমন নিঃস্বার্থ সাধক পাওয়া দুর্লভ। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশে মাদরাসায় শিক্ষকতা, ফরিদাবাদ মাদরাসা সংলগ্ন "এদারাতুল মাআরিফ' নামে বাংলা ভাষায় ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, জমিয়াতুল মুদাররিসীন সংগঠন গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন এবং মূল্যবান বহু গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।

---

[১] *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; *বাংলাদেশের খাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুনীর আহমদ সিদ্দীকী

[১৯১৭-১৯৮৯]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা মুনীর আহমদ ১৯১৭ সালে নোয়াখালী জেলার আমানতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পীর ছিদ্দিক উল্লাহ।[১] মাওলানা মুনীর আহমদ নোয়াখালীর জমিদার হাটের মাওলানা ইব্রাহীম আহমদপুরীর পরিচালিত মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাওলানা মুনীর আহমদ ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম মিরসরাই 'সুফিয়া মাদরাসায়' ভর্তি হয়ে সেখানে চার বছর অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে তিনি ১৯৩৯ সালে ফাযিল, ১৯৪১ সালে কামিল হাদীস এবং ১৯৪৩ সালে কামিল ফিক্‌হ পরীক্ষায় পাস করে।[২]

কর্মজীবন

মাওলানা মুনীর আহমদ শিক্ষাজীবনের শেষ দিকে কলকাতা ওয়াছেদ মোল্লা মার্কেটের মসজিদে ইমামতির দায়িত্বে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করলে তিনি চাকুরি ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এসে তিনি "আমর বিল মা'রূফ ওনাহী 'আনিল মুনকার" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ বাড়ীর মসজিদকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মসজিদেও উক্ত সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাম-মুয়াযিনদেরকে এ সংগঠনের সদস্য বানানো হয়। তিনি প্রতিদিন এক একটি মসজিদে গিয়ে মুসল্লীগণকে ভাল কাজে অংশগ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। তাঁর এ কাজে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই এ সংগঠনে যোগ দেন। ক্রমেই এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় চৌমুহনীর ছায়েদুল হক নামের তাবলীগী জামা'য়াতের এক বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁকে তাবলীগী জামা'য়াতের দিকে আকৃষ্ট করেন। অতঃপর ছায়েদুল হক মাওলানা মুনীর আহমদকে ঢাকা নিয়ে যান। সেখান থেকে দিল্লীতে গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করেন। দেশে ফিরে মাওলানা মুনীর নিজের সাংগঠনকে তাবলীগী সংগঠনের রূপ দেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি কাকরাইলের তাবলীগ জামাতের নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[৩]

মাওলানা মুনীর আহমদের তাবলীগী অবদান

মাওলানা মুনীর আহমদ ১৯৪৮ সালে তাবলীগ জামা'য়াতের সাথে কাজ শুরু করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নেতৃত্বে জামা'য়াত চলতে থাকে। দা'ওয়াতী জামা'আত নিয়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বহুদেশে সফর করেছেন। তাঁর হাতে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালে

---

[১] ডক্টর মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, পৃ. ২২২-২২৩।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ৬ জনের জামা'য়াত নিয়ে আমেরিকায় যান। উক্ত সফরে ১৭৫ জন আমেরিকান তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।

১৯৫২ সালে লালবাগ থেকে কাকরাইলে তাবলীগী মারকায স্থানান্তরিত করা হয়। তখন কাকরাইল মসজিদের নাম ছিল মালওয়ালী মসজিদ। মাওলানা মুনীর আহমদ এ মসজিদে ইমামতি করতেন। মালওয়ালী মসজিদ সম্প্রসারিত হয়ে কাকরাইল মসজিদে রূপান্তরিত হলে তিনি এ মসজিদের একটি রুমে অবস্থান করতেন। বাংলাদেশে তৎকালীন তাবলীগী জামা'য়াতের মজলিশে শুরার ৬ জন কেন্দ্রীয় সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।[১]

ইন্তেকাল

মাওলানা মুনীর আহমদ ১৯৮৯ সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন।[২]

মাওলানা মুনীর আহমদ ছিলেন তৎকালীন তাবলীগ জামা'য়াতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। দ্বীনের দা'ওয়াত প্রচার-প্রসারে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা প্রশংসাযোগ্য।

---

[১] ডক্টর হাসান মোহাম্মদ, *তাবলীগ আন্দোলন ও তাবলীগ জামায়াত*, ঢাকা, কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০০, পৃ. ৪৮।

[২] *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯--২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আলী আকবর

[১৯০৮-১৯৩৮]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা আলী আকবর ১৯০৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শ্যামবাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্সী সেকান্দার আলী চৌধুরী।[১] মাওলানা আলী আকবর তাঁর পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর সৈয়দাবাদ মাদরাসায় ভর্তি হন। এরপর বরুড়া মাদরাসায় কিছুদিন লেখাপড়া করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়া ইসলামিয়াতে ভর্তি হন এবং এখান থেকে তিনি "জামাত-এ উলা" পাস করেন।[২]

দেওবন্দ গমন ও তাবলীগী কাজের প্রেরণা লাভ

মাওলানা আলী আকবর উচ্চ শিক্ষার জন্য দেওবন্দ গমন করেন। এ সময় মাওলানা ইউসুফ একটি জামা'য়াত নিয়ে দেওবন্দ আসেন। মাওলানা আলী আকবর দেওবন্দ থেকে মুলতান পর্যন্ত মাওলানা ইউসুফ এর সাথে সফর করেন। এ সফরেই তিনি তাবলীগী দা'ওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হন।[৩] দেওবন্দ মাদরাসার শিক্ষা শেষে তিনি দেশে ফিরে এসে সৈয়দাবাদ মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। পাশাপাশি তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি মাওলানা তাজুল ইসলামসহ শহরের মুরব্বীগণকে নিয়ে প্রত্যেক চন্দ্রমাসের ৯ তারিখে পরামর্শ করে বিভিন্ন মসজিদে তা'লীমের ব্যবস্থা করতেন এবং বয়ান রাখতেন।[৪]

সার্বিকভাবে তাবলীগী কাজে আত্মনিয়োগ

১৯৫২ সালে কাকরাইল মসজিদটি তাবলীগী মারকাযে পরিণত হয়। ফলে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার তাবলীগ জামায়াতের নেতৃস্থানীয়গণ এখানে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। মাওলানা আলী আকবর এ সময় মাদরাসার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ব্যাপকভাবে তাবলীগী কাজ করার আগ্রহ নিয়ে কাকরাইলে উপস্থিত হন।[৫]

মাওলানা আলী আকবর তাবলীগ জামা'য়াতের বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে তিনি দা'ওয়াতী সফর করেছেন। এছাড়া বিশ্বের বহু দেশে তিনি তাবলীগী সফর করেছেন।[৬]

---

[১] *আমরা যাদের উত্তরসুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

[২] মোহাম্মদ ইসরাইল, *বিশ্বের আকাশে তাবলীগী তারকা*, বইঘর লাইব্রেরী, ১৯৯৬, পৃ. ২৬; *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

[৩] *আমরা যাদের উত্তরসুরী*, (নিরপুর, জুন ১৯৯৮), পৃ. ২৯০।

[৪] *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

[৫] *বিশ্বের আকাশে তাবলীগী তারকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

[৬] *তাবলীগ আন্দোলন ও তাবলীগ জামায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল

মাওলানা আলী আকবর ১৯৯৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার ইন্তেকাল করেন।[১]

পথহারা মানুষকে ইসলামের আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে মাওলানা আলী আকবর দেশে-বিদেশে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিরলসভাবে যে প্রচষ্টা চালিয়েছেন তাঁর এ অবদান পরবর্তী মুবাল্লিগদের প্রেরণা যোগাবে।

---

[১] *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১; *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা লুৎফর রহমান

[১৯৩০-১৯৮৭)]

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

নোয়াখালী জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম মাওলানা লুৎফর রহমান ১৯৩০ সালে চাটখিল উপজেলার বাইসিন্দুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মনছুর আহমদ।[১] মাওলানা লুৎফর রহমান বাইসিন্দুর গ্রামের স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর তিনি কচুয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। পরে নোয়াখালীর টুমচর মাদরাসা থেকে তিনি আলিম (ছূয়াম) এবং ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় পাস করেন।[২] অতঃপর ১৯৫৭ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন।[৩]

মাওলানা লুৎফর রহমানের তাবলীগী খিদমত

মাওলানা লুৎফর রহমান ঢাকা আলিয়া মাদরাসার ছাত্র অবস্থায় কাকরাইল মসজিদে আসা-যাওয়া করতেন। তখন থেকেই তিনি কাকরাইলের নেতৃস্থানীয়দের নিকট পরিচিত হয়ে উঠেন। চাটখিল মাদরাসায় যোগদানের পর তিনি এবং মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা নূর মোহাম্মদ দুজনেই ঐ অঞ্চলে তাবলীগ করতেন। তাবলীগী কাজে অধিক মনোযোগী হওয়ার কারণে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের আপত্তি দেখা দিলে তিনি ১৯৬৮ সালে মাদরাসার চাকুরী ছেড়ে দেন।[৪] এরপর থেকে তিনি তাবলীগী কাজে অধিক সময় দিতে থাকেন। মাওলানা লুৎফর রহমান বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় তাবলীগী সফর করেছেন।[৫] তিনি বাংলা, উর্দ্দু ও আরবী ভাষায় সমপারদর্শী ছিলেন এবং বক্তব্য দিতেন। তিনি অনুবাদক হিসেবেও পারদর্শী ছিলেন এবং বিদেশী মেহমানদের বক্তব্য অনুবাদ করে শুনাতেন।

মাওলানা লুৎফুর রহমান তাবলীগী জামায়াত নিয়ে বিশ্বের বহু দেশে সফর করেছেন। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে তিনি তাবলীগী কাজে গমন করেছেন। এভাবে বছরের অধিকাংশ সময় তিনি দেশের বাইরে কাটাতেন। তাঁর হাতে বহু অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করেছে।[৬]

---

[১] *আত তুরাগ*, ১০ খন্ড, জুলাই, ১৯৮৯ পৃ. ৫; *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০; *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

[২] *আত তুরাগ*, ১০ খন্ড, জুলাই, ১৯৮৯ পৃ. ৬।

[৩] *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৪; *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১।

[৪] *আত তুরাগ*, ১০ খন্ড, জুলাই, ১৯৮৯ পৃ. ৬।

[৫] *আত তুরাগ*, ১০ খন্ড, জুলাই, ১৯৮৯ পৃ. ৭।

[৬] *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল

মাওলানা লুৎফুর রহমান ১৯৮৭ সালের মে মাসে এক দাওয়াতী জামায়াত নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যান। দাওয়াতী কাজে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে পৌঁছে ১৯৮৭ সালের ১৭ই মে তিনি ইন্তেকাল করেন। আবুধাবিতে রাজকীয় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১] তিনি সমগ্র জীবনে তাবলীগী খিদমতের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষের কাছে ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শ নিরলসভাবে তুলে ধরেছেন।

---

[১] *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

আল্লামা আযীযুর রহমান ১৯১৩ সালে ঝালকাঠি জেলার নেছারাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পিতা মফিজউদ্দিন।[১] মাওলানা আযীযুর রহমান জীবনের শেষ দিকে কায়েদ উপাধিতে বেশি পরিচিতি পান। মাওলানা নেছারাবাদী স্থানীয় পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন করে ১৯২৫ সালে ভোলা সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদরাসায় ১৯২৯ সাল পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর ১৯৩০ সালে ছারছীনা মাদরাসায় পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত উক্ত মাদরাসায় অধ্যয়ন করে জামাতে উলা পাস করেন। অতঃপর কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৪২ সালে হাদীস বিষয়ে কামিল পাস করেন।[২]

শিক্ষকতা

আযীযুর রহমান নেছারাবাদী শিক্ষা শেষে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এসে ১৯৪২ সালে ছারছীনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষকতায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। দীর্ঘ দিন ছারছীনা মাদরাসায় ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালনের পর তিনি ১৯৬৭ সাথে অবসর গ্রহণ করেন।[৩]

শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

আযীযুর রহমান শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি নিজ বাড়িতে জিনাতুন্নেছা মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ঝালকাঠী এন. এন. কামিল মাদরাসাসহ বেশ কিছু হেফজখানা স্থাপন করেন। তাঁর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. জিরাইল আযীযিয়া ফাজিল মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ,
২. কুতুবনগর আযীযিয়া দাখিল মাদরাসা,
৩. উঃ জুরকাঠী আযীযিয়া দাখিল মাদরাসা, নলছিটি,
৪. চন্ডিপুর বাগেরহাট আযীযিয়া দাখিল মাদরাসা, পিরোজপুর,
৫. জিনাতুন্নেসা আযীযিয়া (বালিকা) আলিম মাদরাসা, ঝালকাঠী,
৬. জিরাইল মফিজিয়া (বালিকা) দাখিল মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ,
৭. তিমিরকাঠী ফাতেমিয়া (বালিকা) মাদরাসা, নলছিটি,
৮. বিকনা আযীযিয়া ইবতেদায়ী মাদারাসা,
৯. পিপলিতা আযীযিয়া নুরানী মাদারাসা,

---

[১] মুফতী মাজহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০১১, পৃ. ৩০৩।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

১০. রূপাতলী আযীযিয়া নুরানী মাদরাসা,

১১. কিফাইত নগর আযীযিয়া নুরানী মাদরাসা,

১২. রহমানিয়া আযীযিয়া ইয়াতীমখানা, ঝালকাঠী,

১৩. গরীবে নেওয়াজ আযীযিয়া ইয়াতীমখানা, বাকেরগঞ্জ,

১৪. লেশপ্রতাপ আযীযিয়া কারীমিয়া ক্যাডেট মাদরাসা,

১৫. দর্জিবাড়ি আযীযিয়া ছালামিয়া মাদরাসা (মক্তক ও হেফযখানা)।[১]

সাংগঠনিক তৎপরতা

শর্ষীনার পীর নেছারুদ্দীন আহমদের পৃষ্ঠপোষকতায় জমিয়তে হিযবুল্লাহ নামে যে সংগঠনটি রয়েছে, মাওলানা আযীযুর রহমান ছিলেন তার প্রধান কর্ণধার। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি উক্ত সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২]

কায়েদ উপাধি

তরুণ আযীযুর রহমানের তারুণ্যদীপ্ত নেতৃত্বে অল্প দিনের মধ্যেই জমিয়তে হিযবুল্লাহর কার্যক্রম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালের পূর্বেই দেশব্যাপী এর সাত শ'র অধিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তরুণ আযীযের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খুশী হয়ে নেছারুদ্দীন আহমদ তাঁকে কায়েদ সাহেব (মান্যবর নেতা) উপাধিতে ভূষিত করেন। পীর নেছারুদ্দীন বলতেন, "আমার কায়েদ বিশ্ব জয় করবে ইনশাআল্লাহ্'। বর্তমানে কায়েদ সাহেব নামেই তিনি অধিক পরিচিত।[৩]

ইসলামী ঐক্য সম্মেলন ১৯৭০

মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে ঝালকাঠী স্টেডিয়ামে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ওলামা মাখায়েখের সমন্বয়ে ঐক্যের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তিনি ইত্তিহাদুল উম্মাহ গঠন করেন এবং বিভিন্ন ঐক্যের ডাকে সাড়া দেন। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে তিনি ঐক্যের প্রতি আহ্বান জানান।

ঐক্য সম্মেলন ১৯৯৭ (ঐক্যের ১ম মহাসম্মেলন) : ঐক্যের এই প্রথম সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন সম্বন্ধে অধ্যাপক গোলাম আযম লিখেছেন- "১৯৯৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ঝালকাঠীতে শর্ষীনার 'কায়েদ সাহেব' নামে খ্যাত মাওলানা আযীযুর রহমানের উদ্যোগে তাঁরই মাদরাসায় ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে দেশের সর্বস্তরের ইসলামপন্থীদের ঐক্য প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটিতে মাওলানা আযীযুর রহমান, চরমোনাইর পীর সাইয়েদ ফজলুল করীম, ড. মুস্তাফিজুর রহমান এবং মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীও ছিলেন। তাঁর ঐক্যের মহান উদ্দেশ্যে ঐদিন একটা চমৎকার নীতিকথা ব্যবহার করেছিলেন। আর তা হলো "ইত্তিহাদ মাআল ইখতিলাফ (মতপার্থক্য সহই ঐক্য)।"

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

ঐক্য সম্মেলন ১৯৯৮ (ঐক্যের ২য় মহাসম্মেলন) : এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালের ১৭ ও ১৮ মার্চ ঝালকাঠী নেছারাবাদ ছালেহীয়া আলিয়া মাদরাসা ময়দানে। এ সম্মেলনের যে রিপোর্ট সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ হতে প্রকাশিত হয়েছিল, তার কিয়দংশ এরূপ-

"সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওলামা, মাশায়েখ, ইমাম, ইসলামপন্থী ও দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দসহ লাখো জনসমষ্টির মাঝে বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুসলিহীনের আমীর মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, দীন রক্ষার স্বার্থে আজ যেমন মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজন, তেমনি দেশ ও জাতির স্বার্থে দল-মত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক ভাইয়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। তিনি তাঁর ভাষণে ইত্তেহাদ মাআল ইখতেলাফ (মত পার্থক্যসহ ঐক্য) এই নীতির আলোকে সকল শ্রেণীর মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীনের খিদমত আঞ্জাম দেয়ার আহ্বান জানান।"[১]

গ্রন্থ রচনায় অবদান

আল্লামা আযীযুর রহমান বহু গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন। তার তালিকা মোটামুটি তুলে ধরা হলো :

১. আহলে ছুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় ও আকায়েদ

১. ইসলাম ও তাছাওফ

২. ইসলামী জিন্দেগী

সংকলিত গ্রন্থ

১. খোতবাতে ছালেহিয়া

২. ইসলামী জিন্দেগীর বুনিয়াদী চল্লিশ হাদীস

১. মুজাদ্দেদে আলফেছানী (র.)-এর কামিয়াবী ও কর্মপদ্ধতি

২. ইমামুদ্দীন নোয়াখালভী (র.)-এর জীবনী

শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক গ্রন্থ

১. হেদায়েতে কোরআন

২. হেদায়াতুল মুছলেমীন

৩. জিকরুন্নবী (দ.) [১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড]

ভাষণ ও ভাষণ-সংকলন

১. ইসলাম ও জিহাদ

২. ইসলাম ও রাজনীতি

৩. ইসরাঈলী রাষ্ট্র ও মুসলমান

৪. বর্তমানে পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কর্তব্য

৫. সত্যের সংগ্রাম চলবে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পথ

৭. প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ্‌ওয়ালা সমাজকেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ

৮. মানুষ পাপ করে কেন?

৯. বিপদ আপদের কারণ ও উহা হতে মুক্তিলাভের উপায়

১০. ঈমান তত্ত্ব

১১. আমাদের শক্তির তিনটি উৎস

১২. শরীয়তী বিচার

১৩. মাতা-পিতা ও সন্তানের হক

১৪. আটরশীর হাকীকত

১৫. চরমোনাইর হাকীকত

১৬. দুর্নীতির সংজ্ঞা ও উহা দমনের কর্মসূচী

১৭. দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনটি ভাষণ

২০. দিশারী ১, ২, ৩, ৪, ৫ ।[১]

ইন্তেকাল

আল্লামা আযীযুর রহমান ২০০৮ সালে এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন । তাঁকে নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স সংলগ্ন মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয় ।[২]

আল্লামা আযীযুর রহমান ছিলেন একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব । ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ২৫ বছর ছারছিনা দারুস সুন্নাহ আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা, বহু মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জমিয়তে হিজবুল্লাহ নামক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা, ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে তাঁর উদ্যোগে ওলামাদের সর্বদলীয় ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠান ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে বহু গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি অবদানের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১ ।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ১৯১৯ সালে তৎকালীন ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগনাস্থ লৌহজং থানার ভিরিচ খা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আলহাজ্ব এরশাদ আলী।[১]

আল্লামা আজিজুল হক গ্রামের মক্তবে কিছুদিন পড়ার পর ৭ বছর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জামিয়া ইউনুসিয়ায় ভর্তি হয়ে সেখানে ৪ বছর পড়ালেখা করেন। অতঃপর ১৯৩১ সালে ঢাকার বড় কাটরা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১২ বছর পড়ালেখা করে দাওরা-এ হাদীস পাস করেন। ১৯৪৩ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতের বোম্বের সুরত জেলার ডাভেল ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সর্বশেষে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে তাফসীর বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।[২]

কর্মজীবন

আল্লামা আজিজুল হক শিক্ষাশেষে ঢাকাস্থ বড় কাটরা মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সেখানে ১৯৪৬-৫২ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ঢাকার লালবাগ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। সেখানে নিষ্ঠার সাথে বুখারী শরীফের অধ্যাপনা করায় তাকে 'শাইখুল হাদীস' উপাধি দেয়া হয়। লালবাগে অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭১ সাল থেকে ২ বছর বরিশাল মাহমুদিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-বেফাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ৩ বছর বুখারী শরীফের অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৬ সালে জামিয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া নামে মোহাম্মদপুরস্থ মোহাম্মদী হাউজিং-এ একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। ১৯৮৮ সালে মোহাম্মদপুর সাত মসজিদের পার্শ্বে 'জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া' নামে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়েক বছর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মালিবাগ জামিয়া শরইয়্যার প্রিন্সিপাল হিসেবেও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতোপূর্বে মুহাম্মদপুর লালমটিয়া মাদরাসা, মালিবাগ জামিয়া শরইয়্যা, সিরাজগঞ্জের বতুয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দারুস সালাম মাদরাসা, মিরপুর-১৪ জামি'উল উলূম মাদরাসা, জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, লালমাটিয়া জামেয়া ইসলামিয়ায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বুখারী শরীফের দারস দিয়েছেন। তিনি লালবাগ কিল্লা মসজিদ, মালিবাগ শাহী জামে মসজিদ ও আজীমপুর স্টেট জামে মসজিদের সম্মানীত খতীব হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্বে ছিলেন।[৩]

---

[১] *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক জীবন

আল্লামা আজিজুল হক ছাত্র জীবনেই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনেও বিশেষ ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সে সময়ে উলামা কিরামের একমাত্র দল জমিয়াত-এ- উলামায়ে ইসলামের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮১ সালে হাফেজ্জী হুজুরের ডাকে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৮২ সালে হাফেজ্জী হুজুরের সফর সঙ্গী হয়ে ইরান-ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন।

১৯৮৫ সালে লন্ডনের মুসলিম ইনস্টিটিউট এর আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্যে সফর করেন এবং বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অন্যতম রূপকার ছিলেন।

১৯৮৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৯১ সাথে সমমনা কয়েকটি ইসলামী দল নিয়ে ইসলামী ঐক্যজোট গঠন করেন এবং তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ইসলামী ঐক্য জোট ১৯৯১ সালে সংসদ নির্বাচনে ১টি আসন (সিলেট-৫) লাভ করে।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে মিছিল, মিটিংসহ নানামুখী আন্দোলনে সক্রিয় হন।

১৯৯৩ সালের ২-৪ জানুয়ারী বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণের দাবিতে (ঢাকা থেকে যশোর সীমান্ত এলাকার উদ্দেশ্যে) লং মার্চের নেতৃত্ব দেন।

১৯৯৩ সালে ভারতের নরসীমা রাও-এর বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে (বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার অপরাধে) প্রতিরোধের কর্মসূচি দেয়ায় তিনি ৯ এপ্রিল ১৯৯৩ গ্রেফতার হন এবং ১৯৯৩ সালের ৮ মে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৯৬ সালে ১২ জুন তার নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোট জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১ টি আসন লাভ করেন।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

১৯৯৯ সালে চারদলীয় জোটে শরীক হন।

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি হাই কোর্ট থেকে ফতওয়া বিরোধী পরামর্শ দেয়া হলে এর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

২০০১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে ফতওয়া বিরোধী রায় বাতিলের দাবিতে বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন।

২০০১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রংপুর থেকে সমাবেশ করে ফেরার পথে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হন। অতঃপর ২০০১ কারা মুক্তি লাভ করেন।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর চারদলীয় জোটের শরীক দল হিসেবে তার নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোট সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৩টি আসন লাভ করে।

২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেন।[১]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ রচনায় অবদান

১. বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ

২. বুখারী শরীফের উর্দূ ব্যাখ্যা

৩. 'মুসলিম শরীফ ও হাদীসের ছয় কিতাব' নামে ৩ খণ্ডে হাদীস সংকল করেন। এতে বিষয়ভিত্তিক হাদীসসমূহ অনুবাদসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডন

৫. মাসনুন দু'আ সম্বলিত মুনাজাতে মাকবুল (অনুবাদ)

৬. মাসনবীয়ে রুমীর বঙ্গানুবাদ

৭. পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম

৮. সত্যের পথে সংগ্রাম (বয়ান সংকলন)।[১]

ইন্তেকাল

আল্লামা আজিজুল হক ২০১২ সালের ৮ই আগস্ট ইন্তেকাল করেন। কেরানীগঞ্জের আটি বাজার সংলগ্ন ঘাটারচর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

আল্লামা আজিজুল হক এমন একজন প্রখ্যাত আলিম যিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বাংলাদেশের অসংখ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে আলিম-এ-দ্বীন তৈরির কাজে অতিবাহিত করেছেন। অনুবাদ ও রচনা করেছেন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থাবলী। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নেমেছেন রাজপথে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে রেখেছেন বলিষ্ঠ ভূমিকা। দ্বীনের খেদমতে তাঁর অবদানের জন্য জাতি তাঁকে দীর্ঘদিন স্মরণে রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম ৯ ভাদ্র, ১৩৪৪ বাংলা মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল জেলার কোতয়ালী থানাধীন চরমোনাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক।[১] সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীমের প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয় স্বীয় পিতার নিকট। তিনি বরিশালের আহসানাবাদ চরমোনাই জামেয়া রশীদিয়া মাদরাসায় কিছুদিন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৫৭ সালে রাজধানী ঢাকা গমন করেন। তিনি জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকা থেকে দাওরা-এ হাদীস পাস করেন।[২]

কর্মজীবন

সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীমের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৫৮ সালে চরমোনাই জামেয়া রশীদিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে।[৩] তিনি দীর্ঘ ২২ বছর সেখানে শিক্ষকতা করেন।[৪] ১৯৭৩ সালে পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাকের ইন্তেকালের পর তিনি পীর সাহেব চরমোনাই বাংলাদেশে মুজাহিদ কমিটির আমীরের দায়িত্ব পান। তিনি এদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন।[৫]

ইসলাম প্রচার

সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন এবং ভক্ত তৈরি করেন। বাংলাদেশের বাইরেও তাঁর কিছু ভক্ত রয়েছে। ইসলাম বিরোধী যে কোন ইস্যুতে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলাম ও মানবতার স্বার্থে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।[৬]

ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ

সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিতার সঙ্গে নেজামে ইসলাম পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৯৫ সাথে তার ওপর ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অর্পিত হলে নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। তাসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলন ও ২০০১ সালের ১ জানুয়ারী হাইকোর্ট থেকে সকল প্রকার ফতোয়া

---

[১] মাওলানা মোহাম্মদ ওমর, *মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)*, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ২৩; *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

[২] *মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩১; *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

[৩] *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

[৪] *মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

[৫] *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

[৬] *মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২, ৯৫-৯৮; *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

অবৈধ ঘোষণার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীমের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।[১]

ইন্তেকাল

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুর করীম ২০০৬ সালের ২৫ নভেম্বর শনিবার বরিশাল জেলার চরমোনাই নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। তাকে চরমোনাই জামেয়ায় পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।[২]

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুর করীম ছিলেন দ্বীনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে নিরলস ও নিবেদিতপ্রাণ। দ্বীনের তা'লীমের ক্ষেত্রেও ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। তিনি অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ছিলেন বজ্রকঠোর। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিল বহুমুখী।

---

[১] *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

[২] *মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬; *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মুফ্‌তী ফজলুল হক আমিনী

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মুফতী ফজলুল হক আমিনী ১৯৪৫ সালে ১৫ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আমিনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব ওয়ায়েজ উদ্দিন। আমিনপুর এলাকার দিকে সম্পর্কিত করে তাকে আমিনী বলা হয়।[১] মুফতী ফজলুল হক আমিনী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জামেয়া ইউনুসিয়ায় কুর'আন ও প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে ঢাকার জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি দাওরা-এ হাদীস সনদ লাভ করেন।[২] অতঃপর তিনি ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের 'করাচী নিউটাউন মাদরাসায়' ভর্তি হয়ে হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর (মুফতী) ডিগ্রি অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র নয় মাসে তিনি সম্পূর্ণ কুর'আন হিফজ করেন।[৩]

কর্মজীবন

মুফতী ফজলুল হক আমিনী ১৯৭০ সালে কামরাঙ্গীরচর জামেয়া নূরিয়ায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ বছরই তিনি হাফেজ্জী হুজুর (র)-এর কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭৫ সালে তিনি জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসার উস্তাদ ও সহকারী মুফ্‌তী হিসেবে যোগদান করেন।[৪] ১৯৮৪ সালে লালবাগ জামেয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফ্‌তীর দায়িত্ব পালন করেন।[৫] ১৯৮৭ সালে হাফেজ্জী হুজুর (র)-এর ইন্তেকালের পর থেকে তিনি লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়ার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সালে খেলাফত আন্দোলন গঠিত হলে তিনি এ সংগঠনের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পান।

২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি চারদলীয় ঐক্যজোটের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২ নির্বাচনী আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[৬] তিনি লন্ডন, সিরিয়া, ভারত, কুয়েত ও পাকিস্তান সফর করেছেন। ইরান, ইরাক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধে ১৯৮৪ সালে তিনি হাফেজ্জী হুজুর (র)-এর শান্তি মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।[৭]

---

[১] *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৪।
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৪।
[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।
[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল

মুফতী ফজলুল হক আমিনী ২০১২ সালের ১২ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। মুফতী ফজলুল হক আমিনী ছিলেন বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম বীর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও বজ্রকঠোর এবং ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মাদরাসায় হাদীস অধ্যাপনার পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর এরূপ অবদানের উসিলায় আল্লাহ্ তাকে জান্নাতবাসী করুন-আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহমান

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

মাওলানা হাবিবুর রহমান ১৯৫৩ সালের ৮ জুলাই সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন ফুলবাড়ি ইউনিয়নের হাজীপুর (ঘনশ্যাম) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা মাহমুদ আলী।[১] মাওলানা হাবিবুর রহমান ফুরবাড়ি ইউনিয়নের বইটির প্রাইমারী স্কুল ও রুস্তুমপুর কওমী মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর ফুরবাড়ি আজিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে ১৯৭০ সালে ফাজিল পাস করেন। ১৯৭৩ সালে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল হাদীস বিভাগে মেধাতালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন।[২]

কর্মজীবন

মাওলানা হাবিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে সিলেট শহরে কাজীর বাজার মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি উক্ত এলাকায় সকলের সহযোগিতায় একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তাঁর প্রচেষ্টায় মক্তবের কলেবর বৃদ্ধি করে নির্মিত হয় জামেয়া মাদানীয়া কাজির বাজার মাদরাসা।[৩]

রাজনীতি ও সাংগঠনিত তৎপরতা

মাওলানা হাবিবুর রহমান ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তৎকালীন সময়ে জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়া মুসলিম ছাত্র পরিষদের অন্যতম দায়িত্বশীল ছিলেন। পরবর্তীতে দেশের শীর্ষস্থানীয় 'উলামা-মাশায়িখ ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের তিনি কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মনোনীত হন।

১৯৮১ সালের সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সমাচার পত্রিকায় সরদার আলাউদ্দীন নামক জনৈক মুরতাদ অধ্যাপকের পবিত্র কুর'আন অবমাননাকারী একটি প্রবন্ধ ছাপা হলে তাঁর সাহস্য নেতৃত্বে সমগ্র সিলেটে দুর্বার আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৯৯০ সালের ২৪ জুন' স্থানীয় কাজির বাজার এলাকায় পবিত্র রমজান মাসে প্রকাশ্যে পানাহারের প্রতিবাদ করেন এবং এজন্য তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।[৪]

১৯৭৯ সালে সউদী আরবের পবিত্র হেরেম শরীফে অগ্নি সংযোগের ঘটনার জন্য আয়োজিত প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর ভারতের অযোধ্যায় উগ্রহিন্দু কর্তৃক ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁর নেতৃত্বে সিলেটে শান্তিপূর্ণ হরতালের আহ্বান করা হয়।

---

[১] *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকা'ইদ সংরক্ষণের জন্য তিনি দেশ বরেণ্য আলিম ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের নিয়ে 'সাহাবা সৈনিক পরিষদ' গঠন করেন।[১]

১৯৭৭ সালে সিলেট স্টেডিয়ামে জুয়া, হাউজি, অশ্লীয় নাচ-গান ইত্যাদির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ফলে মাওলানা ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি উক্ত প্রদর্শনী বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। পরে উক্ত প্রদর্শনী বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৯৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও তার সকল লেখা বাজেয়াপ্ত করার দাবীতে তিনি সিলেট রেজিস্ট্রারী মাঠে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেন। অতঃপর উক্ত দাবী উপেক্ষিত হলে ১৯৯৩ সালের ৯ অক্টোবর তাঁর নির্দেশে সিলেটে স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালন এবং ১৯ অক্টোবর ঢাকায় শীর্ষ আলিমদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২১ মে এ প্রেক্ষাপটে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ১৯৯৩ সালের ২৮ নভেম্বর তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় সংসদ অভিমুখে মিছিল বের হয়। ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

মাওলানা হাবিবুর রহমান ইসলামী মূল্যবোধ ও দ্বীনি খেদমত পালনের অংশ হিসেবে বৃটেন, ভারত, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সফর করেন।[২]

সেবামূলক কাজ

মাওলানা হাবিবুর রহমান এতিম, বিধবা ও অসহায় মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে 'আল মারকাজুল খায়রি আল ইসলামী' সংগঠন গঠন করেন। সেবামূলক এ সংস্থাটির রয়েছে বিভিন্ন মানবসেবামূলক কার্যক্রম।[৩]

মাওলানা হাবিবুর রহমান একাধারে সুবক্তা, বিজ্ঞ আলিম, নিবেদিতপ্রাণ, শিক্ষাবিদ, জনপ্রিয় সংগঠক ও ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন সিপাহসালার। তিনি অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। যখনই ইসলামের উপর কোন আঘাত এসেছে তিনি বজ্রকণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেছেন, রাজপথে নেমেছেন। অবহেলিত জালালাবাদে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ও উজ্জীবনে তিনি রেখেছেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮-৩৪০।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক, মাসিক মদিনা

পরিচয়

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বাংলাদেশের সাহিত্য সাংবাদিকতার জগতে প্রবীণ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। লেখনীর মাধ্যমে অবক্ষয়গ্রস্থ জাতিকে উজ্জীবিত করতে তাঁর প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। তিনি শুধুমাত্র একজন আলিম হিসেবেই নিজকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং ধর্মীয় সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক নেতৃত্ব, সমাজসেবক, আর্ন্তজাতিক সংগঠকসহ বহু কর্মকান্ডের সাথেই ওতপ্রৎভাবে জড়িয়ে আছেন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ৭ বৈশাখ ১৩৪২ বাংলা শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আনসার উদ্দীন খান।[১]

গ্রন্থ রচনায় অবদান

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন। যা ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বিরাট ভূমিকা রাখছে। তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকা পেশ করা হলো :

১. প্রিয় নবীজীর (সা.) প্রিয়প্রসঙ্গ
২. স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)
৩. রওজা শরীফের ইতিকথা
৪. হাদীসে রাসূল (সা.)
৫. নূরুল ঈমান (১ম ও ২য় খন্ড)
৬. খাযায়েনুল ইরফান
৭. শহীদ হাসানুল বান্নার রচনাবলী
৮.তালিমুল হজ্জ
৯. জীবনের খেলাঘরে (আত্মজীবনী)
১০. আহকামে রমযান
১১. হযরতজী মাও. ইলয়াস (রহ.)
১২. তালিমুস সালাত
১৩. ইমাম যয়নুল আবেদীন
১৪. কুড়ানো মানিক (১-৫ম খন্ড)
১৫. ইসলাম ও সমকালীন বিস্ময়কর কয়েকটি ঘটনা
১৬. বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)
১৭. মহা মানবগণের অমর বাণী সম্ভার
১৮. আম্বিয়া (আ.), সাহাবায়ে কেরাম ও মনীষীগণের জীবনী প্রসঙ্গ
১৯. কুর'আন পরিচিতি

---

[১] *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

২০. আকায়েদে ইসলাম
২১. হাদীসে রাসূলের (সা.) দৃষ্টিতে কিয়ামতের আলামত

বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

২২. কুর'আন ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ
২৩.আকাইদ, পবিত্রতা ও নামায প্রসঙ্গ
২৪. ইমাম, ঈদ ও মসজিদ প্রসঙ্গ
২৫. মৃত্যু ও পরকাল প্রসঙ্গ
২৬. বিবাহ ও পারিবারিক প্রসঙ্গ
২৭. অর্থনীতি ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব প্রসঙ্গ
২৮. হজ্জ, কুরবানী ও তাবলীগ প্রসঙ্গ
২৯. অপরাধ, দন্ডবিধি ও ইতিহাস প্রসঙ্গ
৩০. খাদ্য পানীয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রসঙ্গ
৩১. রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
৩২. রোযা, যাকাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

অনূদিত গ্রন্থাবলী

৩৩. বঙ্গানুবাদ কুর'আনুল কারীম
৩৪. তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন
৩৫. ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সা.)
৩৬. প্রিয় নবীজীর অন্তরঙ্গ জীবন
৩৭. শাওয়াহেদুন নবুওয়ত
৩৮. হৃদয়তীর্থ মদীনার পথে
৩৯. খাসায়েসুল কুবরা
৪০. রহমাতুল লিল আলামীন সীরাতুন্নবী (সা.) (১-৩য় খন্ড)
৪১. ইমাম গাযালী, তাসাউফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা
৪২. আল-মুরশিদুল আমীন
৪৩. প্রিয়তম নবীর (সা.) প্রিয় সুন্নতসমূহ
৪৪. মু'মিনের জীবনযাপন পদ্ধতি
৪৫. মারেফাত জ্ঞানের রত্নভান্ডার
৪৬. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (১-৫ম খন্ড)
৪৭. মাকতুবাত
৪৮. ইসলামী তাসাউফের স্বরূপ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের বড় অবদান হলো তার ক্ষুরধার লেখনী। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত ও অনুবাদ গ্রন্থাবলী ইসলামী সাহিত্যের ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। আমরা তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।[১]

---

[১] গ্রন্থের তালিকা (গবেষক কর্তৃক) 'মদীনা পাবলিকেশন্স- এর গ্রন্থাবলী'র তালিকা থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর সিরাজুল হক

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

ডক্টর সিরাজুল হক ১৯০৫ সালে এপ্রিল মাসে বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ভোলাকোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হামিদুল্লাহ।[১]

সিরাজুল হকের শিক্ষাজীবন শুরু হয় নিজ গ্রামের এক মক্তবে। মক্তবের শিক্ষা শেষে রামগঞ্জের ভাট্টা মাদরাসায় পড়ালেখা শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১২ বছর বয়সে ঢাকায় এসে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ঢাকার মুহসিনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই মাদ্‌রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গৃহীত 'স্পেশাল মেট্রিকুলেশন' পরীক্ষায় তিনি পাস করেন এবং ঢাকার ইসলামিক ইন্টামেডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে বি.এ.অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। পরের বছর একই বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিঃস্থ পরীক্ষার্থী হিসেবে ফারসী বিষয়েও এম এ ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন

সিরাজুল হক ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী লেকচারার হিসেবে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি বৃটেনের University of London-এ পি-এইচ.ডি করতে যান এবং ১৯৩৭ সাথে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।[২]

দেশে ফিরে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি লেকচারার থেকে রিডার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৫১ সালে তিনি প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় চাকরি জীবনে তিনি প্রক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লাইব্রেরীয়ান হিসেবে এক বছর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শিক্ষকতার জীবনে ১৯৬৪-৬৫ সালে প্রথমবার এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে দ্বিতীয়বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীনের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক ১৯২৮ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করা থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থেকে সুদীর্ঘ ৪২ বছরের কর্মজীবনের অবসান ঘটান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কিছু দিন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ এবং ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।[৩] শিক্ষা ও গবেষণার মূল্যবান অবদানের জন্য তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৭৫ সালে ইসলামিক

---

[১] তোফায়েল আহমদ, *মাসিক লক্ষ্মীপুর বার্তা সংস্থা*, সংখ্যা- ৬, মে- ২০০২।

[২] মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *দৈনিক দেশবাংলা*, সংখ্যা- ১৯১, ২৬ এপ্রিল ২০০৫।

[৩] জনাব বদরুদ্দীন আহমেদ, উপ-রেজিস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. *সিরাজুল হকের ব্যক্তিগত ফাইল*; তোফায়েল আহমেদ, *মাসিক লক্ষ্মীপুর বার্তা সংস্থা*, সংখ্যা- ৬, মে- ২০০২; আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্টাডিজ বিভাগে 'প্রফেসর ইমেরিটাস' হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তিনি এ পদে আমৃত্যু (২০০৫ সাল) কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৭৯-১৯৮০ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদে আসীন হন এবং উক্ত সোসাইটির ফেলোশীপ লাভ করেন।[১]

গবেষণামূলক প্রকাশনা

অধ্যাপক ড. সিরাজুল হকের বিভিন্ন ভাষায় এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণামূলক জার্নালে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হলো[২] :

১। আল-হারীরী (ইংরেজি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, ১৯৩৩।

২। Ibn Taimiyya and His Anthro-pomorphism, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, ১৯৩৪।

৩। Some Side-lights on the Nusairis, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, ১৯৩৫।

৪। Ibn Taimiyya's Conception of Analogy and Consensus, Islamic Culture, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৯৪৩।

৫। Sama and Rags of the Darwaishes, Islamic Culture, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৯৪৫।

৬। A letter of Ibn Taimiyya to Prince historian Abu'l-Fida, The Documenta islamic in Inedita, ১৯৫২ বার্লিন, পূর্ব জার্মানী।

৭। Teaching of Arabic in Pakistan, UNESCO VOLUME on the Teaching of modern languages, Paris, ১৯৫৫।

৮। A Poem of Imam Ibn Taimiyya on Predestination Journal Asiatic Society of Pakistan, ১৯৫২।[৩]

৯। Su'al li Ibn Taimiyya, Journal Asiatic Society of Pakistan, ১৯৫৭।

১০। Bahaism and it's Philosophy, Pakistan Philosophical Congress-এর কার্যবিবরণী, ১৯৫৮।

১১। Concept of Beauty in Islam, Pakistan Philosophical Congress, -এর কার্যবিবরণী, ১৯৬২।

১২। Ibn Taimiyya on Radd-al-Mantiq, A History of Muslim Philosophy, MM Sharif, Wiesbaden, ১৯৬৩-১৯৬৬, ২ খণ্ডে প্রকাশিত।

১৩। Al-Qaidatu marrakushiyya, Arabic and Islamic Studies গ্রন্থে প্রকাশিত, Leiden, Brill, ১৯৬৫।

---

[১] খ. ম. কামাল, *মাসিক লক্ষ্মীপুর বার্তা*, সংখ্যা-১২, মার্চ ১৯৯২; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *দৈনিক দেশবাংলা*, সংখ্যা-১৯১, ২৬ এপ্রিল ২০০৫।

[২] আ. ত. ম নুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৬; জনাব বদরুদ্দীন আহমেদ, উপ-রেজিস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. *সিরাজুল হকের ব্যক্তিগত ফাইল*।

[৩] আ. ত. ম নুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। Al-Islam Wal-salam-al-Alami, (আরবী), আল-আরাব পত্রিকায় প্রকাশিত, করাচী, ১৯৫৮।

১৫। Islam's Attiude towards Progress, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির কার্য বিবরণী, ১৯৭৭।[১]

১৬। German Contribution to Arabic and Islamic Studies, Asiatic Society of Bangladesh, ১৯৭৪।

১৭। Imam Ibn Taimiyya and His Projects of Reform শিরোনামে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাকৃত তাঁর পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ।[২]

ড. সিরাজুল হক ১৯৩৭ সালে University of London থেকে Ph.D. ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর Ph.D. অভিসন্দর্ভটি (Imam Ibn Taimiyya and His Projects of Reform) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান "ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহঃ) ও তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা" শিরোনামে অনুবাদ করেছেন যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।[৩]

সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য

ড. সিরাজুল হক শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতি কর্মে নিয়োজিত বেশ কিছু সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নে পেশ হলো[৪] :

১। Institute of Islamic Education and Research (I.I.E.R) ঢাকা, বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক কমিটির চেয়ারম্যান।

২। দীর্ঘকাল যাবত 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' ঢাকা-এর বোর্ড অফ গভর্নর্স-এর সদস্য।

৩। সরকারি তিতুমীর কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান।

৪। হাবিবিয়া কলেজ, ঢাকা-এর ব্যবস্থাপক কমিটির চেয়ারম্যান।

৫। বাংলাদেশ ইসলামিক শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

৬। ঢাকা যাদুঘর-এর সম্মানিত সদস্য ছিলেন।

৭। বাংলাদেশ যাকাত বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ছিলেন।[৫]

---

[১] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৭; মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান, 'শিক্ষাবিদ গবেষক ড. সিরাজুল হক' *মাসিক সত্যপ্রবাহ*, ৮ম সংখ্যা, এপ্রিল '০২, পৃষ্ঠা ৫-৮।

[২] মোহাম্মদ বদরুল আমিন খান, 'শিক্ষাবিদ গবেষক ড. সিরাজুল হক' *মাসিক সত্যপ্রবাহ*, ৮ম সংখ্যা, এপ্রিল '০২, পৃষ্ঠা ৫-৮।

[৩] মোহাম্মদ বদরুল আমিন খান, 'শিক্ষাবিদ গবেষক ড. সিরাজুল হক' *মাসিক সত্যপ্রবাহ*, ৮ম সংখ্যা, এপ্রিল '০২, পৃষ্ঠা ৫-৮; আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৬।

[৪] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৯।

[৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *দৈনিক দেশবাংলা*, সংখ্যা- ১৯১, ২৬ এপ্রিল ২০০৫; আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৮ । The Alumnai Association of German University of Bangladesh-এর প্রেসিডেন্ট ।

৯ । Council of Islamic Socio-Cultural Organization (CISCO)-এর প্রেসিডেন্ট ।

১০ । ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ও বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ-এর সম্পাদনা পরিষদ-এর সদস্য এবং শেষের দিকে চেয়ারম্যান ।[১]

১১ । ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত "সীরাত বিশ্বকোষ" সম্পাদনা পরিষদের চেয়ারম্যান (অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) ।[২]

১২ । বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি একাধিকবার সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ।[৩]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ ও বিদেশ ভ্রমণ

অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ।

১ । ১৯৩৫ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য লন্ডন গমন করেন ।

২ । ১৯৩৬ সালে জার্মানীর বনে অনুষ্ঠিত International Oriental Conference-এ ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করেন ।

৩ । ১৯৫৩ সালে সীলনের নূওয়ারা ইলিয়াস (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) UNESCO কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল- Contribution of Modern Languages towards living in a World Community. সেখানে তিনি The Teaching of Arabic in Pakistan শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ।

৪ । ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান উলামা দলের সদস্য হিসেবে তিনি চীন সফরে যান এবং সেখানে তিনি এক মাস অবস্থান করেন । সেখানে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মসজিদসমূহ পরিদর্শন করেন ।

৫ । ১৯৫৬ সালে Leader এজেন্টে প্রকল্প অংশ নিতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ তিন মাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর করেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ।

৬ । ১৯৫৭ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ।

৭ । ১৯৫৮ সালে তিনি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত দর্শন সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনে যোগ দেন । সম্মেলনে তিনি Bahaism and its Philosophy শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ।

৮ । ১৯৬০ সালে পশ্চিম জার্মানীর Margurgh-এ অনুষ্ঠিত History of Religion সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন ।

---

[১] আ. ফ. ম. ইয়াহইয়া, *বিশ্বকোষ প্রকাশনা উৎসব স্মরণিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ ।

[২] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৯ ।

[৩] A Quarterly *NEWSLETTER*, Asiatic Society Of Bangladesh, Vol-4, No-1, P-6, January-March 1979, P-6

Dhaka University Institutional Repository

৯। ১৯৬০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান দর্শন সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করে The Gradesh of Truth as expanded by Imam Ibn Taimiyya শিরোনামে একটি প্রবন্ধ তিনি উপস্থাপন করেন।

১০। ১৯৬৩ সালে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান দর্শন সম্মেলনের দশম অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন।

১১। ১৯৬৫ সালে তিনি কায়রোর 'জামি' আল আযহারে' অনুষ্ঠিত ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। অতঃপর আল-আযহারের শেখ হাসানা আল মামূনের সাথে গাজা এলাকায় দুর্গত ও বিপর্যস্ত ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের দেখতে যান।

১২। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বেলজিয়ামের Lau Vain বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত Religion for Peace বিষয়ক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

১৩। ১৯৭৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় ভূগোল বিষয়ক সম্মেলনে "ইয়াকুত আলরূমী : ভূগোল বিষয়ে তাঁর অবদান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১৪। ১৯৭৬ সালে বাগদাদে অনুষ্ঠিত উলামা কনফারেন্সে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ প্রবন্ধ দু'টির শিরোনাম হচ্ছে-

(ক) ইসলামস এ্যাটিচুড টুয়ার্ডস রিভিল্ড রিলিজিয়ন্স।

(খ) জায়োনিজম এন্ড ইটস এক্সপ্যানশনিস্ট এ্যাটিচুড।

১৫। ১৯৭৬ সালে ইমাম বুখারীর (রহঃ) জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের তাসখন্দ ও সমরকন্দ সফর করেন।

১৬। ১৯৭৭ সালে তিনি দর্শন সম্মেলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং Islams Attitude towards Material Progress শীর্ষক একটি প্রবন্ধও উপস্থাপন করেন।

১৭। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি U.S.A এর নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে (Princeton university) WCRP-এর সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সময় তিনি জাতিসংঘ সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট কার্টার এবং WRCP এর অবৈতনিক চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট নিকিও নোয়ানোর সাথে ফটো সেশনে অংশ নেন। একই বছর ভারতের দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলী উপলক্ষ্যে উদযাপিত বৃহৎ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন এবং Some Basic Principles of Constitution of an Islamic State প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

১৮। ১৯৭৯ সালে Organization of Islamic Conference (OIC) এর তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি যোগদান করেন। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল : Application of Shariah. সেখানে তিনি Islam and Science শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯। ১৯৮১ সালে তিনি জাপানের টোকিওতে UNESCO কর্তৃক আয়োজিত Moral Education in Asian Countries শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশের ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে তিনি Moral Education in Bangladesh শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠক করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২০। ১৯৮১ সালে মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালনসহ পাঠ্য বই উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও দায়িত্ব পালন করেন।

২১। ১৯৮১ সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় জাতীয় ভূগোল বিষয়ক সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং সভাপতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।[১] একই বছর তিনি নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত Religion for Peace শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন এবং সেখানে Education for Peace শিরোনামে একটি প্রবন্ধও উপস্থাপন করেন।[২]

২২। ১৯৮৪ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ Asian Conference of Religion from Peace শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৩। ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের জাতীয় হিজরী কাউন্সিলের উপদেষ্টা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক হিজরী সম্মেলনে যোগদান করেন।[৩]

স্বীকৃতি

অধ্যাপক ড. সিরাজুল হকের বিভিন্নমুখী অবদানের জন্য তার স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫ সালে তাঁকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের 'প্রফেসর ইমেরিটাস' হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন এবং আমৃত্যু তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. সিরাজুল হকের নামানুসারে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে "ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র" (Dr. Serajul Hoque Center for Islamic Research) প্রতিষ্ঠা করে।

দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে যে অনন্য সম্মাননায় ভূষিত করেছেন তার কয়েকটি হলো :

১। তাঁর বহুমুখী ধর্মীয়, সেবা, শিক্ষা ও গবেষণায় মূল্যবান অবদানের জন্য ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে "সিতারা-ই-ইমতিয়ায" উপাধিতে ভূষিত করেন।

২। ১৯৭৩ সালে Asiatic Society Of Bangladesh তাঁকে ফেলোশীপ প্রদান করে।

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৩ সালে তাঁকে 'স্বাধীনতা পদক' প্রদান করে।[৪]

৪। ইসলাম বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯৮৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তাঁকে 'সম্মাননা পদক' প্রদান করে।

৫। ১৯৯৬ সালে এসিয়াটিক সোসাইটি অব কলকাতা তাঁকে 'প্রফেসর সুকুমার সেন স্বর্ণপদক' প্রদান করে।

---

[১] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৮।

[২] খ. ম. কামাল, *মাসিক লক্ষ্মীপুর বার্তা*, সংখ্যা-১২, মার্চ ১৯৯২: জনাব বদরুদ্দীন আহমেদ, উপ-রেজিস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. *সিরাজুল হকের ব্যক্তিগত ফাইল*।

[৩] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৮।

[৪] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৯।

৬। ১৯৯৭ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

৭। ২০০২ সালে ঢাকা আহছানিয়া মিশন তাঁকে "খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ স্বর্ণপদক"-এ ভূষিত করেন।[১]

উল্লেখযোগ্য অবদান

ড. সিরাজুল হক দেশ-বিদেশ থেকে কয়েক হাজার মূল্যবান দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে স্বীয় বাসভবনে একটি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তাঁর লাইব্রেরীটি আলমারিসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন।[২] গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও ম্যাগাজিনের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। নানা উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত স্বর্ণপদক ও বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার এমনকি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পরিহিত গাউনটিও সংরক্ষণের জন্য ঢাকা যাদুঘরকে তিনি প্রদান করেছেন।[৩]

ইন্তেকাল

ড. সিরাজুল হক ২০০৫ সালে ৪ এপ্রিল সোমবার ঢাকার লালমাটিয়ায় অবস্থিত মিলেনিয়াম হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।[৪]

---

[১] জনাব বদরুদ্দীন আহমেদ, উপ-রেজিস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *ড. সিরাজুল হকের ব্যক্তিগত ফাইল*।

[২] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ২০; ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ, *দৈনিক দেশবাংলা*, সংখ্যা- ১৯১, ২৬ এপ্রিল ২০০৫; জনাব বদরুদ্দীন আহমেদ, উপ-রেজিস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *ড. সিরাজুল হকের ব্যক্তিগত ফাইল*।

[৩] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ২০।

[৪] আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, ড. সিরাজুল হক : সুপরিচিত জ্ঞানতাপস বহু শিক্ষকের শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ২২; ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ, *দৈনিক দেশবাংলা*, সংখ্যা- ১৯১, ২৬ এপ্রিল ২০০৫; *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, অনুঃ ড. সিরাজুল ইসলাম : জীবন ও কর্ম, লেখক ড. মুহাম্মদ শফীকুর রহমান, বর্ষ ১ সংখ্যা, ১ জানুয়ারী-জুন ২০০৭, প্রকাশক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১১০০, পৃ. ৮০-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী

(১৯৩০-২০০৩)

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী ১৯৩০ সালে বগুড়ায় তাঁর মাতুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দিনাজপুর জেলার সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। পিতা আল্লামা আবদুল্লাহিল বাকী ছিলেন আরবী, ফার্সি এবং উর্দু সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত। জনগণের দুর্দশা লাঘবে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।[১]

ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী শিক্ষাজীবন শুরু করেন হাই মাদরাসায়। তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম বিভাগে (একাদশ স্থান) হাই মাদরাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) ভর্তি হন এবং ১৯৪৬ সালে ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং ১৯৫০ সালে একই বিভাগ থেকে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল ডিগ্রি লাভ করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর গবেষণার সুপারভাইজার ছিলেন দুই বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এইচ. এ. আর. গিব (Gibb) এবং প্রফেসর যোসেফ সার্খত (Schartch)। পরে তিনি কিছুদিন আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণার কাজ করেন। তাঁর মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি লাভ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক, নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক, বাহরুল উলূম উবায়দী সোহওয়ার্দী স্বর্ণপদক প্রভৃতি।[২]

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী বিলেত থেকে ফিরে এসে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিসে সরাসরি অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করে প্রায় এক বছর ঢাকা কলেজে এবং কয়েক মাস রাজশাহী কলেজে আরবী বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে ড.এম.এ বারী রাজশাহী বিশ্বদ্যালয়ের রীডার পদে যোগদান করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে ৪১ বছর বয়সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে ড. এম এ বারী শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক পান। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে তিনি পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ অলংকৃত করেন। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ের প্রথম নির্বাচিত

---

[১] মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন, *যাঁদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, পৃ. ৩৩১; এ.এস.এম. রফিকুল ইসলাম, *অভিভাষণ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)*, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মে, ২০১০, পৃ. ১৭।

[২] প্রফেসর এ এইচ এম শামসুর রহমান, *মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি*, আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী, ২০১০, পৃ. ৩৪২-২৪৩; *অভিভাষণ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ভাইস চ্যান্সেলর। ১৯৮১ সালের শুরুতে তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং দুই মেয়াদে আট বছর অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছাড়াও তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এবং সিলেটের শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জরী কমিশন থেকে অবসর গ্রহণের পর কলেজসমূহের উন্নতিকল্পে অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে তিনি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ মর্যাদায় উপদেষ্টা নিয়োজিত হন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যোগে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে তিনিই প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের একটি সেরা কৃর্তী। ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ছোটদের ইসলামী বিশ্বকোষ এর চেয়ারম্যান এবং এক সময় ইসলামী ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্ণরস এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৭টিরও অধিক দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ২৩টির অধিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন।[১]

নিষ্ঠার সাথে জমঈয়ত আহলে হাদীসের দায়িত্ব পালন

১৯৬০ সালে বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা, বিরল ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পান্ডিত্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ৪৩ বছরে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ৩৫টি সাংগঠনিক জেলা, সাড়ে পাঁচশত এলাকা, এবং ছয় সহস্রাধিক শাখা জমঈয়ত গঠনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন আহলে হাদীস জামা'আতকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেছেন। তিনি জমঈয়তের অবিসংবাদিত নেতা ও কাণ্ডারী হিসেবে পাঁচটি সফল ও স্বার্থক জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জমঈয়তে আহলে হাদীসের পরিচিতি আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২]

অন্যান্য অবদান

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর কাজী আলাউদ্দীন রোড থেকে আলহাজ্জ মাজেদ সরদারের সহযোগিতায় ৯৮, নওয়াবপুরে ক্রয়কৃত জমিতে জমঈয়ত অফিস প্রতিষ্ঠা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারীর একটি অমর কীর্তি। এছাড়া উত্তর যাত্রাবাড়ীতে জমঈয়তের জন্য ২৬ কাঠা জমি এবং আন্ত র্জাতিকমানের একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রাজধানীর অদূরে সাভার থানার বাইপাইলে ক্রয় করেছেন প্রায় ৫০ বিঘা সম্পত্তি। গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ী-ভাওরাইদে ৪বিঘা জমি খরিদ করে তিনি নওমুসলিমদের পুনর্বাসন করে গেছেন। এছাড়া ছিন্নমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছেন কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয়। জমঈয়তের

---

[১] *মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪; *অভিভাষণ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

[২] *অভিভাষণ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

সৌজন্যে এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, মসজিদ ও এতীমখানা। কিন্তু জনদরদী এই মানুষটি নিজের জন্য কিছুই করেননি।[১]

সম্মেলনে যোগদান

১। ১৯৫৫ সালে তিনি আমেরিকার হাভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল সামার সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন।

২। ১৯৫৭ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৮ এর জানুয়ারী পর্যন্ত লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন।

৩। ১৯৬০ সালে রাজশাহীতে পাকিস্তান ইতিহাস কনফারেন্স-এর আয়োজন করেন।

৪। ১৯৬৭ সালে আমেরিকার মিসিগানে ২৭তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদদের কংগ্রেসে যোগদান করেন।

৫। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের জনগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর সেমিনারের আয়োজন করেন।

৬। ১৯৬৯ সালে কুয়ালালামপুর মালায়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৭। ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত মুসলিমদের শিক্ষা বিষয়ক ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে যোগদান করেন।

৮। ১৯৭৭ সালে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অনুষ্ঠিত ধর্মবেত্তাগণের শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ের উপর কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৯। ১৯৮০ সালে রিয়াদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব সপ্তাহ' শীর্ষক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

১০। ১৯৮০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১১। ১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ১৩তম কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

১২। ১৯৮৪ সালে সউদী আরবে মদীনা আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দাওয়াহ বিশ্ব কনফারেন্সে যোগদান করেন।

১৩। ১৯৮৫ সালে ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ও ভলগা অঞ্চলে চ্যান্সেলরদের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করেন।

১৪। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার উরাল ও ভলগা অঞ্চলে ইসলামের অভ্যুদয়ের দ্বিশত বার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউরোপীয় এবং সাইবেরীয় অঞ্চলে মুসলিম ধর্মীয় বোর্ড কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গমন করেন।

---

[১] *অভিভাষণ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। ১৯৯০ সালে মক্কা মুকাররামায় রাবেতা আলম আল ইসলামী আয়োজিত উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতির উপর আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্সে যোগদান করেন।[১]

ইন্তেকাল

ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী ২০০৩ সালের ৪ জুন বুধবার ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।[২]

---

[১] *মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬।

[২] *যাঁদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬; *অভিভাষণ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; *মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

ড. মুজীবুর রহমান ১৯৩৬ সালের ১লা জুলাই তৎকালীন ভারতের মালদহ জেলার বাবলাবোনা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল গনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত লোক।[১]

পিতা অধ্যাপক আব্দুল গনির নিকট তাঁর শিক্ষাজীবনের হাতে খড়ি হয়। অতঃপর তিনি আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাধাকান্তপুর আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ইতোপূর্বে তিনি ডাকাতপুকুর ইসলামপুর কওমী মাদরাসাতেও মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ হুসাইনের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। তারও আগে তিনি দাদনচক হাই মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর থেকে তিনি প্রতিটি ক্লাসে প্রতিটি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।[২]

মুজীবুর রহমান ১৯৫৩ সালে মাদ্রাসা-ই আলিয়া (ঢাকা) থেকে ১ম বিভাগে ফাজিল পাস করেন। এ শ্রেণীতে তিনি সাধারণ বৃত্তিলাভ ছাড়াও ইংরেজীতে জাতীয়ভাবে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় একটি বিশেষ বৃত্তিও লাভ করেন। একই মাদরাসা থেকে ১৯৫৫ সালে কামিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে অষ্টম স্থান লাভ করেন।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী লায়ালপুর সালাফিয়া মাদরাসা থেকে দরজা-ই-তাকমীল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৫৭ সালে পাকিস্তানের মন্টোগোমারী জেলার ওকাড়াস্থ জামেয়া' মুহাম্মাদীয়া থেকে 'ফারীগুত্ তাহসীল' পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে সম্মানজনক পুরস্কার (Award) লাভ করেন।

১৯৬২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত লাহোর ইসলামিক কলেজ থেকে এম. এ. ডিগ্রী সহ এম.ও.এল (Masters of Oriental Languages) ডিগ্রী লাভ করেন।[৩]

কর্মজীবন

ড. মুজীবুর রহমান শিক্ষাজীবন শেষে দেশে ফিরে পিতার কর্মস্থল দাদনচক কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে তিনি এক বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে অধ্যাপনা করার পর ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের আরবী ও উর্দূ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে তিনি ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত একটানা প্রায় ছয় বছর স্বীয় অধ্যাপনার দায়িত্ব সুচারুরূপে চালিয়ে যান। ইতোমধ্যে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

---

[১] ড. মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, রূপম প্রকাশনী, পাবনা, পৃ. ১৩।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত এ ডিগ্রী তাঁর কর্মজীবনকে আরো এক বৃহৎ পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এবং একই সাথে উর্দূরও প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি প্রভাষক পদ থেকে পদোন্নতি লাভ করে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। পরে ১৯৭৯ সালে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ করেন।

অধ্যাপক মুজীবুর রহমান ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল "বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা"। ১৯৮৬ সালে তাঁর থিসিসটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়।[১]

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ এবং সভা-সম্মেলনে অংশগ্রহণ

ড. মুজীবুর রহমান বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্নমুখী জাতীয় সম্মেলন এবং বড় বড় সভা সমিতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে ইসলামী তাহ্‌জীব ও তমুদ্দুন এবং ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। অনুরূপভাবে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে তিনি বিদেশের বহু সম্মেলনে যোগদান এবং চিন্তাদীপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধরাজি উপস্থাপন করে দেশের মান মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন।

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও তিনি বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। এভাবে উম্মুল ক্বোরা ও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, করাচী, মুলতান ও বাওয়ালপুর বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ও ইসলামাবাদ এবং এসব শহরে অনুষ্ঠিত বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ভাষণ দান ও চিন্তা দীপ্ত প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে তিনি ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

অনুরূপভাবে লন্ডন, বার্মিহাম, লেইস্টার, ইস্তামবুল, রাজস্থান, আসারেম রতনপুর, হাইলাকান্দী প্রভৃতি শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারেও তিনি বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করেন এবং মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[২]

দেশ-বিদেশের সেমিনারে অংশগ্রহণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা :

১। ১৯৮১ সালে ভারতের আসাম প্রদেশের হাইলাকান্দীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

২। ১৯৮২ সালে নয়াদিল্লী আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

৩। ১৯৮২ সালে দিল্লীর আইয়ানে গালিবে অনুষ্ঠিত সম্মেলন।

৪। ১৯৮৪ সালে নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সেমিনার।

৫। ১৯৮৪ সালে রাজস্থানের আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

৬। ১৯৮৪ সালে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।

৭। ১৯৮৫ সালে কলকাতার আলিয়া মাদ্রসার ২০০ বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মেলন।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

৮। ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক কুর'আন কংগ্রেস।

৯। ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে সীরাত কনফারেন্স।

১০। ১৯৮৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে আন্তর্জাতিক কুর'আন কনফারেন্স।

১১। ১৯৮৭ সালে ভারতের কেরালায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুজাহিদ কনফারেন্স।

১২। ১৯৮৮ সালে লন্ডনের হিল্টন অলিম্পিয়া হোটেলে অনুষ্ঠিত প্রথম ইউরোপিয়ান কনফারেন্স।

১৩। ১৯৮৮ সালে বার্মিহামে দাওয়াহ কনফারেন্স।

১৪। ১৯৮৯ সালে ভারতের পাটনা খোদাবক্স লাইব্রেরীতে আন্তর্জাতিক দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সেমিনার।

১৫। ১৯৮৯ সালে কলকাতার মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সম্মেলন।

মোটকথা, এ সকল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুবাদে এবং উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই তিনি প্রায় ১২-১৪টি দেশে ভ্রমণ করেছেন।[১]

বিভিন্ন সংগঠন ও সমিতির সদস্যপদ লাভ

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সদস্য পদ লাভ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংগঠন ও সংস্থার একটি তালিকা পেশ করা হলো :

১। বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা।

২। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা।

৩। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, রাজশাহী।

৪। শাহ্ মাখদুম ইনস্টিউট, রাজশাহী।

৫। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

৭। কলকাতা ইন্দো আরব কালচারাল এসোসিয়েশন, কলকাতা।[২]

গ্রন্থ রচনায় অবদান

সেই যে কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে শুরু হয়েছিল তাঁর লেখা। আজও লিখে চলেছেন। ধীরে ধীরে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থের তালিকা পেশ করা হলো :

১। কুর'আনের চিরন্তন মু'জিযা।

২। ইমাম বুখারী (রহ.)।

৩। ইমাম মুসলিম (রহ.)।

৪। ইমাম নাসাঈ (রহ.)।

৫। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬। মদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ)।
৭। মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা (১ম খণ্ড)।
৮। মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা (১ম ও ২য় খণ্ড)।
৯। সাহাবী কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য "বানাত সুয়াদ"।
১০। ইসলামে আদি যুগের একটি আদর্শ পরিবার।
১১। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সময়কাল।
১২। মুহাদ্দিস প্রসঙ্গে (চার খণ্ডে সমাপ্ত)।
১৩। মাযামীনে মুজীব (প্রথম খণ্ড, নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশ)।
১৪। নবীজীর (সঃ) নামাজ (সালাতে মুহাম্মাদী) (সম্পাদিত)।
১৫। বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চার পটভূমি (পশ্চিম বঙ্গ থেকে প্রকাশিত)।
১৬। ভারতীয় আরবী তাফসীর ও তাফসীরকার।
১৭। মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী।
১৮। তাফসীর ইবনে কাসীর (১৮ খণ্ডে এবং দশ ভলিউমে সমাপ্ত)।
১৯। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)।
২০। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান।
২১। জীবন ধারা।
২২। মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ)।
২৩। মিশরের ছোট গল্প (অনুবাদ)।
২৪। ইসলামিক এ্যাটিচ্যুড টু ওয়ার্ডস নন-মুসলিম (অনূদিত)।
২৫। ইযাজুল কুর'আন।
২৬। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ)।
২৭। কুর'আন শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন।
২৮। ইসলামী সাহিত্য চর্চায় আলিমুদ্দিন আহমদ।
২৯। ইদ্রিস আহমদ মিয়া।
৩০। আল্লামা যামাখশারী।
৩১। জাহান-আরা বেগম।
৩২। মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর উর্দূ সংস্করণ।
৩৩। ইসলামের আদি যুগের একটি আদর্শ পরিবার শীর্ষক বইয়ের ইংরেজী সংস্করণ।
৩৪। রহমাতুল্লিল 'আলামীন (দু' খণ্ডে সমাপ্ত)।
৩৫। মহান বদরের যুদ্ধ।
৩৬। কুর'আনের গল্প ভিত্তিক উপদেশ।
৩৭। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ)।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। মহিমান্বিত কুর'আনের মকবুল মুনাজাত (Dua From The Glorious Quran-এর অনুবাদ)।

৩৯। Miracles Of The Holy Quran

৪০। Dua From The Glorious Quran (American).

৪১। The First & The Most Person In The World (American).

৪২। Exegesis Of The Holy Quran (London & Canada).

উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও অসংখ্য পাণ্ডুলিপি তাঁর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে।[১]

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান একাধারে লেখক, গবেষক ও অনুবাদক। যেমন তিনি অনুবাদ কর্মে সফল, তেমন তিনি মৌলিক গবেষণা ও নিবন্ধ রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সফল পদচারণা। তিনি কুরআন ও হাদীসকে তাঁর লেখার ক্ষেত্রে এমনভাবে বিষয় ও উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন ঠিক যেন মৌমাছির মধু আহরণের মতোই। ইসলামী সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অবদানের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ১৯৫১ সালের ২ জানুয়ারি বরিশাল জেলার বানারিপাড়া থানার অন্তর্গত ইলুহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর গফুর। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ছাত্র জীবনের সকল পরীক্ষায় মেধাবৃত্তিসহ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং অনার্স ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন। মাদ্রাসা-ই আলীয়া, ঢাকা থেকে ১৯৬৮ সালে কামিল, শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজ, ঢাকা থেকে ১৯৬৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ১৯৭২ সালে বি. এ অনার্স ও ১৯৭৩ সালে এম. এ পাস করেন। অতঃপর আরবী অভিধান শাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণা করে ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ১৯৭৯ সালে জুন থেকে ১৯৮০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সরকারী ঢাকা কলেজে আরবীর প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের পর ১৯৮৩ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৫ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০০ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০০১ সালের ৫ই জুলাই থেকে তিনি এই বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া ১৯৮১ সাল থেকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে আরবী ভাষার খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও তিনি কর্মরত আছেন।

গ্রন্থ রচনায় অবদান

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের আরবী ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা, ইংরেজী ও আরবীতে বেশ কয়েকটি গবেষণা-প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ও সীরাত বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা-প্রবন্ধ :

১। খলীল ইব্‌ন আহমদ আল-ফারাহীদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৮৮।

২। সমাজচেতনার কবি মা'রূফ আর-রুসাফী, সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত), ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

৩। দুই ভূখণ্ডের কবি খলিল মুতরান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৯২

৪। কবি হাফিজ ইব্রাহীম ও তাঁর কাব্য-প্রতিভা, সাহিত্য পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৯৩

৫। প্রবাসী আরব কবি ঈলিয়া আবূ মাদী, সাহিত্য পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

৬। Abu Bakr Muhammad B.Durayd and His Contribution to Arabic Lexicography, The Dhaka University Studies. June 1991

৭। نشأة المقامات وتطورها عبر العصور The Islamic University Studies (Kushtia), December 1991

৮। محمد بن يعقوب الفيروزابادي وخدماه في الأدب واللغة আল মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যা (আরবী বিভাগ, ঢা.বি. থেকে প্রকাশিত), জানুয়ারি ১৯৯৩

৯। Ibn Sida and His Dictionaries "al-Muhkam" and "al Mukhassas", Journal of the Institute of Modern Languages (D.U.) June, 1995

১০। Ibn Manzur : The Author of Lisan al-Arab, Islamic University Studies (Kushtia) vol.4, No.1, 1995

১১। The Early Arabic Vocabularies, Journal of Bangladesh Foreign Language Teachers Association, June, 1997

১২। الإسلام في منطقة البنغال وبنغلاديش الحالية আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যা, জুন, ২০০১

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী :

১। সরল রীতির কোরআন শরীফ (বাংলা অর্থসহ)
২। কোরআন শরীফের সরল বাংলা অনুবাদ [৩০ পারা]
৩। আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]
৪। আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান [আল-ক্বামূসুল ওয়াজীয]
৫। বাংলা-ইংরেজী-আরবী ব্যবহারিক অভিধান [আল্-ক্বামূসুল ওয়াজীয]
৬। দিশারী ঃ বাংলা-ইংরেজী-আরবী ব্যবহারিক শব্দকোষ
৭। তিন ভাষার পকেট অভিধান (বাংলা-ইংরেজী-আরবী)
৮। আরবী ব্যাকরণ
৯। দৈনন্দিন আরবী কথোপকথন
১০। আরব মনীষা
১১। আদর্শ অনুবাদকোষ [বাংলা-ইংরেজী-আরবী]
১২। আদর্শ নামকোষ (বাংলা-ইংরেজী-আরবী)
১৩। তিন ভাষায় শিক্ষাঙ্গন পরিভাষা (বাংলা-ইংরেজী-আরবী)
১৪। দেশ-বিদেশের পেশা ও পদমর্যাদা (আরবী-ইংরেজী-বাংলা)
১৫। ক্বাছীদাতুল বুরদাহ (অনুবাদসহ)
১৬। কাসীদা-ই-নু'মান (অনুবাদসহ)
১৭। হাফিজ ইব্রাহীম ও মা'রূফ আর-রুসাফীর কাব্য-প্রতিভা
১৮। হারীরীর মাকামাত
১৯। খলীল ইব্‌ন আহমদ ও খলীল মুতরান
২০। ইসলাম ও বাস্তবতার আলোকে আরব জাতীয়তাবাদ (অনুবাদ)[১]

আমরা তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

---

[১] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* [আল-মু'জামুল ওয়াফী], রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১১, গ্রন্থকার পরিচিতি থেকে গৃহীত, পৃ. (ইনার) পাঁচ; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* [আল-ক্বামূসুল ওয়াজীয]।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৩২ সালের ১ এপ্রিল লক্ষ্মীপুর জেলাধীন বাংগাখাঁ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুখলিসুর রহমান। মাতা মরহুমা আম্বিয়া খাতুন।

শিক্ষাজীবনে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ'র হাতে খড়ি হয় পিতার নিকট। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন নিজ গ্রামের বাংগাখাঁ স্কুলে। এরপর লক্ষ্মীপুর দারুল উলূম মাদরাসায় জামা'আতে পাঞ্জুম (অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি নোয়াখালী কারামতিয়া মাদরাসা হতে ১৯৪৩ সালে আলিম পরীক্ষায় তদানীন্তন যুক্ত বাংলায় ১ম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। একই মাদরাসা হতে ১৯৪৫ সালে তিনি ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা সরকারী আলিয়া মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে 'মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন' ডিগ্রী (কামিল হাদীস) লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দু বিষয়ে বি.এ (অনার্স) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন এবং কলা অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি একই বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। দীর্ঘদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে তিনি যথাক্রমে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণীর আরো দু'টি এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা' বিষয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখে এম.ফিল. এবং ১৯৮৩ সালে 'বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য' শীর্ষক গবেষণা থিসিস রচনা করে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৫৩ সালে নিজ এলাকার মান্দারী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র। পরে ১৯৫৫-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসায় নন-গ্যাজেটেড সার্ভিসে সহকারী শিক্ষকরূপে কর্মরত ছিলেন। সিলেটে থাকাকালে তিনি 'সিলেট আঞ্জুমানে তাঁরাক্কী-এ-উর্দু'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৯৫৮ সালের ২৬ আগস্ট রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে উর্দুর প্রভাষক পদে কর্মরত হন। সেখানে তিনি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৬১ সালে পূর্বপদে ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় বদলি হন। ১৯৬২ সালে তাঁকে পুনরায় ঢাকা কলেজে নিয়ে আসা হয়। এখানে তিনি ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১৯৬৬ সালে তিনি এসিসটেন্ট প্রফেসর পদে পদোন্নতি পেয়ে বরিশাল বি.এম কলেজে যোগদান করেন। তিনি সেখানে উর্দু বিভাগের প্রধান ছিলেন। এ সময় তিনি বি.এম. কলেজের 'সৈকত' নামক বার্ষিকীর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুর সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৯২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এ সময় বিভাগের স্বার্থে ৫ বছর তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ঐ মেয়াদ শেষে তাঁকে ৫ বছরের জন্য সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক পদে

Dhaka University Institutional Repository

নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর তাঁকে ১ বছর করে কয়েক দফা খণ্ডকালীন শিক্ষকরূপে নিয়োজিত করা হয়। তিনি ১৯৭২-২০০৮ সাল পর্যন্ত এ বিভাগে মোট ৩৬ বছর অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ যেসব মূল্যবান গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন তার তালিকা পেশ করা হলো-

১। মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক
২। হাকীম হাবীবুর রহমান
৩। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা
৪। বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য
৫। মওলানা ওবায়দুল্লাহ সুহ্‌রাওয়ার্দী
৬। বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ
৭। নওয়াব সলিমুল্লাহ্
৮। নওয়াব আলী চৌধুরী : জীবন ও কর্ম
৯। মওলানা মুহম্মদ আলী জওহর
১০। নওয়াব স্যার সৈয়্যদ শামসুল হুদা
১১। স্যার আব্দুর রহিম : জীবন ও কর্ম
১২। বাংলাদেশের দশ দিশারী
১৩। ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী
১৪। মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী
১৫। পশ্চিম বঙ্গে ফার্সী সাহিত্য
১৬। মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী
১৭। রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা
১৮। মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা
১৯। নওয়াব আবদুল গনী ও নওয়াব আহসানুল্লাহ : জীবন ও কর্ম
২০। নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা
২১। আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম
২২। মুফীদ্ উর্দু মাযামীন (উর্দু)
২৩। নজরুল ইসলাম (উর্দু)
২৪। Some Muslim Stalwarts
২৫। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী
২৬। মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান
২৭। ইকবাল ও নজরুল কাব্যে ভাবধারা
২৮। হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র:) : জীবন ও কর্ম
২৯। ইকবাল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা
৩০। আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ গ্রন্থ

৩১। ভারতে বিদ্রোহের কারণ

৩২। মুসাদ্দাস-এ-হালী

৩৩। শিকওয়া ও জাওয়াব-এ-শিকওয়া

প্রবন্ধ

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ শতাধিক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছেন। যা বিভিন্ন দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

উর্দু প্রবন্ধ

১। মাশরিক্বী পাকিস্তান মেঁ উর্দু (পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু), রোযনামা যমীনদার, লাহোর, ২৮ জমাদাস সানি, ১৩৭৫ হি. (১৯৫৫)

২। মাশরিক্বী পাকিস্তান মেঁ উর্দু কা নয়া রূপ (পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুর নতুন রূপ), দৈনিক পাসবান, ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬।

৩। উর্দু যবান কী পয়দায়িশ আওর উস কি তারাক্বী মেঁ হিন্দুউঁ কা হিসসাহ্, দৈনিক পাসবান, ঢাকা, ১৪ এপ্রিল, ১৯৫৬।

৪। উর্দু যবান ওয়া আদব আওর উস কি দ্বীনী ওয়া মাযহাবী খেদমাত, মাসিক ফারান, করাচী, মে, ১৯৫৬।

৫। উর্দু যবান ওয়া আদব আওর উসকি দ্বীনী ওয়া মাযহাবী খেদমাত, দৈনিক পাসবান, ঢাকা, ১০ এপ্রিল, ১৯৫৬।

৬। উর্দু ক্বাওয়ায়েদ পর এক নযর, দৈনিক পাসবান, ঢাকা, ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৭।

৭। উর্দু কা আছর বাংলা পর, দৈনিক পাসবান, ঢাকা ২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৭।

৮। নজরুর ইসলাম কা আছর মাশরিক্বী পাকিস্তান পর, দৈনিক পাসবান, ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৬২।

৯। নজরুল ইসলাম কী শায়েরী মে আরবী, ফার্সী আওর উর্দু আলফায, দৈনিক পাসবান, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২।

১০। ইকবাল বাংলা মেঁ, মাসিক মাহে নো, করাচী, এপ্রিল, ১৯৬৫, পৃ. ২৪-২৬।

বাংলা প্রবন্ধ

১১। নজরুল সাহিত্য, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়, ১৩৭৩ বাংলা (১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দ), পৃ. ৪৭৩-৪৭৮।

১২। ইকবালের নয়া জাহান, মাসিক সওগাত, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৭৩ বাং, পৃ. ৪৩৭-৪৪৪।

১৩। প্রকৃতির উপর মানব আধিপত্য, বি. এম. কলেজ বার্ষিক ম্যাগাজিন, বরিশাল, আগষ্ট, ১৯৬৬/১৯৬৮, পৃ. ২৯-৩৬।

১৪। সৈয়দ সুলাইমান নাদভী, মাসিক মদিনা, ঢাকা, জুন, ১৯৭৪, পৃ. ৩৯-৫৫।

১৫। জ্ঞান তাপস-ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাসিক মদিনা, ঢাকা, জুলাই, ১৯৭৪, পৃ. ৫৭-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি প্রবন্ধ

১৬। Nawab Muhsinul Mulk. The Monthly Current News, Dhaka, October, 1970, Page-17-20

১৭। Moulana Shibli Numani, The Monthly Current News, Dhaka, November, 1970, Page-40-42

১৮। Haji Shariat Ullah, The Monthly Current News, Dhaka, January-March, 1970, Page 40-44

১৯। Ibn- Taimiyah the Great Reformer of the Muslim world, The Bangladesh Observer, Dhaka, 20th November, 1977

২০। Some Aspects of Iqbal's Philosophy, আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৮৯।

স্বীকৃতি ও সম্মাননা

১। করাচির মাসিক 'সাইয়ারা' পত্রিকা উর্দু সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৬৬ সালে প্রফেসর আবদুল্লাহকে 'নিশান-এ-উর্দু' (উর্দুর পতাকা) খেতাব প্রদান করেন।

২। অনন্যসাধারণ গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডক্টর আবদুল্লাহ সাহেবকে "ইব্রাহীম স্মারক স্বর্ণপদক"-এ ভূষিত করেন (১ অক্টোবর, ১৯৯২)। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে তিনি পদকটি গ্রহণ করেন।

৩। গবেষণামূলক সাহিত্যকর্মের জন্য ঢাকার "কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিস" ১৯৯৪ সালের ২৫ নভেম্বর ডক্টর আবদুল্লাহ সাহেবকে "দেওয়ান আব্দুল হামীদ সাহিত্য পুরস্কার-১৯৯৪" এ ভূষিত করে।

৪। লক্ষ্মীপুর জেলার "সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ" তাঁকে তাঁর বহুবিধ কৃতিত্বের জন্য লক্ষ্মীপুর জেলার জনগণের পক্ষ হতে সংবর্ধনা দেন।[১]

ইন্তেকাল

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। তাঁকে ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

---

[১] তথ্যসূত্র : ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ-র রচনাবলী; ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ-র গ্রন্থাবলীর সূচনালগ্নে প্রদত্ত ভূমিকা, পূর্বকথা ইত্যাদি; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ১২৫-১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার অন্তর্গত আবূ তোরাব নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী মোবারক উল্লাহ এবং মাতা শাফিয়া খাতুন।

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ তাঁর মায়ের কাছে কুর'আন পড়া শিখেন। এরপর তিনি গ্রামের মক্তবে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আবূ তোরাব নগর প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে চাটখিল মাদরাসায় দাখিল আউয়ালে ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে ১৯৬০ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান, ১৯৬২ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান, ১৯৬৪ সালে নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান, ১৯৭২ সালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (তাফসীর) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম পাচলাইশ ওয়াজিদিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (ফিক্‌হ) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি চট্টগ্রামের এম. ই. এস. কলেজ থেকে নাইট সিফটে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ. এস. সি. ও ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের অধীনে আরবী বিষয়ে এম. এ. প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ১৯৭৪ সালে এম. এ. আরবী বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান লাভ করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক থিসিস রচনা করে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ কর্মজীবনের শুরুতে রংপুর জিলার পীরগঞ্জ থানার সরলিয়া এ. টি. এম. সিনিয়র মাদরাসার সুপারেন্টেন্ডেন্ট ১৯৬৪-১৯৬৭, কুড়িগ্রাম সাতদরগাহ আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস ১৯৬৭-১৯৬৮, সিলেট সৎপুর আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস ১৯৬৮, পুনরায় চট্টগ্রাম ওয়াজিদিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস ১৯৬৮, পুনরায় চট্টগ্রাম ওয়াজিদিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস ১৯৬৮-১৯৭৩ এবং রংপুর জেলার বড় রংপুর কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস পদে ১৯৭৩-১৯৭৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগে আরবী বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৮০-১৯৮৬ সাল একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৬-১৯৯০ সাল গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮-১৯৯০ সাল একই বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া প্রথম আবাসিক হল সাদ্দাম হোসেন হল-এর প্রথম প্রভোষ্ট ও সিন্ডেকেট সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৩ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি ২৪-০৮-১৯৯৩ থেকে ০৪-০১-১৯৯৫ পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আরবী বিভাগের সভাপতি থাকাকালীন সময়ে ইসলামিক

Dhaka University Institutional Repository

স্টাডিজ বিভাগকে বিভক্ত করেন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ৫-১-১৯৯৫ থেকে ২৪-৮-১৯৯৬ পর্যন্ত। তিনি ২৭-৫-২০১১ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, 'উলূমুল হাদীস, উসূলুল ফিক্হ, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলো নিম্নে পেশ করা হলো-

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. ইমাম তাহাভী র. জীবন ও কর্ম
২. 'উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড
৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিন জাতি ও ইবলীস
৪. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল-বারী
৫. ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র) ও তার জামি'
৬. হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত
৭. আত্-তাকরীর লিত-তিরমিযী-এর অনুবাদ, মূল শায়খ মাহমূদ হাসান
৮. তাফসীর আত্-তাবারী ২য় খণ্ড (অর্ধেক) অনুবাদ

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. সূরা ইয়াসীনের তাফসীর
২. সূরা আল-ফাতহের তাফসীর
৩. সূরা আর-রাহমানের তাফসীর
৪. সূরা আর-ওয়াকি'আর তাফসীর
৫. তাফসীরু সূরা নূর (এর ১০টি আয়াতের তাফসীর)
৬. উসূলুল ফিক্হ
৭. তাফসীর চর্চায় মাহমূদ আল-আলূসী (র)-এর অবদান
৮. জামি'উত তিরমিযী-এর কিতাবুস-সালাত-এর ব্যাখ্যা
৯. কিয়ামতের নিদর্শন;
১০. শুরুতু আইম্মাস্-সিত্তাহ
১১. ফিকহুল হায়া।

এছাড়া তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) প্রায় ১৫০টি প্রবন্ধ লিখেছেন। যা বিভিন্ন জার্নাল, বিশ্বকোষ ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

ইন্তেকাল

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ২০১১ সালের ২৭ মে রোজ শুক্রবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।[১]

---

[১] তথ্য ডক্টর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ-র রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর সূচনা লগ্নে/সমাপ্তে উপস্থাপিত গ্রন্থকার পরিচিতি থেকে গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলামী সংস্কৃতিতে বাংলাদেশী ওলামার অবদান সম্পর্কিত এ থিসিসে প্রাসঙ্গিকভাবে ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, কুর'আন-হাদীসে বর্ণিত এ সংস্কৃতির স্বরূপ, ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, স্থানীয় ও অন্যান্য সংস্কৃতির পার্থক্য তুলে ধরেছি।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পূর্বে এ দেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ছিল। ৭ম শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবূওয়াত লাভের মাধ্যমে আরব বিশ্বে ইসলামের বিকাশ লাভ করলেও এর প্রভাব কেবল আরব বিশ্বেই সীমিত থাকেনি; বরং আরবের সীমা ছাড়িয়ে প্রাচ্যের দেশগুলোতেও বিস্তার লাভ করে। তখন রাসূলের অনুসারীগণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে আশ্রয় করে এ সব দেশে আগমন করেছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তাঁরা ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছেন। কীভাবে বাংলাদেশসহ প্রাচ্যের দেশগুলোতে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, বর্তমানে এ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ কীভাবে চালু আছে তা-ও আমার এ গবেষণাকর্মে উপস্থাপিত হয়েছে।

তাছাড়া আমার গবেষণার বিষয় যেহেতু ইসলামী সংস্কৃতিতে স্বাধীনতাত্তোর ওলামার অবদান সেহেতু স্বাধীনতা পরবর্তী আলিমদের ৩৫ জনের সংস্কৃতি চর্চার অবদান পেশ করেছি।

১৯৭১ সালের পূর্বে এ দেশে উর্দু ভাষার প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই সে সময় ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার লিখিতরূপটি ছিল উর্দুতে। স্বাধীনতার পর এ সংস্কৃতি চর্চার লিখিতরূপটি বাংলা ভাষাতেই প্রাধান্য পায় এবং বাংলা ভাষাভাষীর অনেকেই বাংলায় সংস্কৃতি চর্চায় এগিয়ে আসেন।

আধুনিক যুগে বাংলাদেশে যে সব মণীষী ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ডক্টর সিরাজুল হক, ডক্টর আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী, ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও ডক্টর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ প্রমূখ মণীষীগণ।

তাঁরা বিভিন্ন বই, গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ, বক্তব্য, আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চার পথকে অধিকতর সুগম করেছেন বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই তাঁদের জীবনীর পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্ন বই, গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ ও বক্তব্যের বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরেছি।

বাংলাদেশের আলিমগণের কেউ কেউ সংস্কারপন্থী ও বিদ'আত বিরোধী, কেউ কেউ কট্টরপন্থী এবং কেউ কেউ উদারপন্থী, কেউ কেউ মাযহাবপন্থী, কেউ কেউ সূফীপন্থী, কেউ কেউ এখানকার প্রচলিত সূফী বিরোধী। তাঁদের সকলেই নিজস্ব আঙ্গিকে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করেছেন। তাই দল-মত নির্বিশেষে এ ধরনের সব পন্থীদের সাংস্কৃতিক অবদান উপস্থাপন করেছি।

আমার লিখিত গবেষণাকর্মটি পাঠে বর্তমান ও অনাগত যুগের পাঠক, গবেষক ও সংস্কৃতির চর্চার আগ্রহীগণ সংস্কৃতি চর্চার বর্তমান ও অতীত ঐতিহ্য জেনে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুর'আনুল কারীম

হাদীস গ্রন্থ

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (ফাতহুল বারীসহ), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ২০০০

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী সম্পাদিত, বৈরুত ছাপা

ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস, *সুনান আবূ দাউদ*, দারুল হাদীস আল-কাহিরাহ (মিসর), ১৯৯৯

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ আত-তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, মাকতাবা শামেলা, (শায়খ আলবানীর তাহক্বীক্বসহ)

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনান ইবনু মাজাহ*, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৯৯৭

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, *মুসনাদ-এ আহমাদ*, মুয়াসসাসাতু রিসালা প্রকাশিত, ২০০১

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ*, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৯৯৫

উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদীস

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, দারুল কিতাব, ২০০০

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০

অভিধান

অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ সমার্থ শব্দ কোষ*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি, কলকাতা, (২য় সংস্করণ ২০১১)

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ড. শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, (চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৪), ঢাকা

Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, (Second Edition 2012)

Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Language Services, Inc, (Third Printing 1976)

ইসলামী সাহিত্য ও অন্যান্য

আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০

আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৪

ডঃ হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭

ড. আব্দুস সালাম হারুন, সিরাতে ইবনে হিশাম (সংক্ষিপ্ত), কুয়েত দারুল বহুসুল ইসলামিয়া, ১৯৮৪

ড..মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫

কে আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৬

ড. মোহাম্মদ আজহার আলী, রেজিনা খানম ও মুহাম্মদ ইবনে ইনাম, *ইসলাম ও শিক্ষা*, পৃ. ৬৬, বি-এড, প্রোগ্রাম সেমিষ্টার ১, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭ শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

মাওলানা সাইয়্যিদ রিয়াসাত আলী নদভী, *ইসলামী নিজামে তা'লীম*, দারুল মুসান্নিফীন, পাকিস্তান, ১৯৯২.

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল জাওযী, *সীরাতে ইবনে আবদুল আজিজ*
মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭
ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস*, গ্লোব লাইব্রেরী লিঃ, ঢাকা, ১৯৭৫
নূসা আনসারী, *মধ্য যুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (৭৫০-১২৫৮)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯
এ কে এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৯
আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪
ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫
T. S. Eliot : *Notes Towards The Defination of Culture*. Publisher : Faber And Faber, London, 1962
M. M. Pichthal : *Cultural Side of islam*. Second Edition, New Delhi 1981

জীবনী গ্রন্থ

জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬,
আবু বকর সিদ্দীক, *উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন*, খোশরোজ কিতাব মহল, মার্চ ২০০৪
মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, আল-কাউসার প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০৯
মাওলানা আমীরুল ইসলাম, *সোনার বাংলার হীরার খনি ৪৫ আওলিয়া জীবনী*, কোহিনূর লাইব্রেরী, জানুয়ারী ২০১২
এসরার আহমদ, মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, ১১/৩, এ. সি. রায় রোড, ঢাকা, তারিখবিহীন
ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫
ডক্টর মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৬
মোহাম্মদ ইসরাইল, *বিশ্বের আকাশে তাবলীগী তারকা*, বইঘর লাইব্রেরী, জানুয়ারী ১৯৯৬
ডক্টর হাসান মোহাম্মদ, *তাবলীগ আন্দোলন ও তাবলীগ জামায়াত*, ঢাকা, কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০০
অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, ১ম খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৫
মুফতী মাজহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০১১
মাওলানা মোহাম্মদ ওমর, *মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)*, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ষষ্ট প্রকাশ, অক্টোবর ২০১০
ড. মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ড. *মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, রূপম প্রকাশনী, পাবনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫
হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদক), *মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮
আবুল মকসুদ, সৈয়দ, *ভাসানী*, সৈয়দ আবুল মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৬
শাহরিয়ার কবির (সম্পাদক), *মাওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৮
ফাইজুস-সালেহীন, *চিরঞ্জীব মওলানা*, সাধারণ প্রকাশনী, ঢাকা, তারিখবিহীন

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *শতাব্দীর সংগ্রামী পুরুষ মওলানা তর্কবাগীশ*, তর্কবাগীশ একাডেমী, ঢাকা, তারিখবিহীন
চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, *জেলা পাবনার ইতিহাস* (৩য় খন্ড), ঢাকা, ১৯৮৬
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, *সমকালীন জীবনবোধ*, সুকথা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮১
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
মাওলানা সালাউদ্দীন জয়নাল, *মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) : জীবন ও দর্শন*, প্রকাশক : মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ২০০৮
নূর হোসেন মজিদী, *মাওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, *মাম্মী প্রকাশনী*, ঢাকা, ২০০৩
মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন, *যাঁদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড
এ.এস.এম. রফিকুল ইসলাম, *অভিভাষণ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)*, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মে, ২০১০
প্রফেসর এ এইচ এম শামসুর রহমান, *মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি*, আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী, ২০১০,
Md, Nuruzzaman, *Who's Who*, Dacca : The Eastern Publication, N.D
Tahawar Ali khan (ed), *Biographical Encyclopaedia Of Pakistan*, Biographical Research Institute, Pakistan, Lahore, 1965-66
A Quarterly *NEWSLETTER*, Asiatic Society Of Bangladesh, Vol-4, No-1, P-6, January-March 1979

পত্রিকা : দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক

দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
মাসিক মদীনা, জানুয়ারী, ১৯৯২
মহানাগরিক, ঢাকা, ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯০
মহানাগরিক, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯০
মহানাগরিক, ঢাকা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯০
সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা, ১৫ ভাদ্র ১৩৯৩/১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
সুন্নত অল-জামায়াত, কলকাতা, ৯ম বর্ষ, মাঘ ১৩৪৮/১৯৪১
মাসিক জাগো মুজাহিদ (ময়মনসিংহ), নভেম্বর ১৯৯২
আত তুরাগ, ১০ খন্ড, জুলাই, ১৯৮৯
মাসিক লক্ষ্মীপুর বার্তা সংস্থা, সংখ্যা- ৬, মে- ২০০২
দৈনিক দেশবাংলা, সংখ্যা- ১৯১, ২৬ এপ্রিল ২০০৫
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৬
মাসিক লক্ষীপুর বার্তা, সংখ্যা-১২, মার্চ ১৯৯২
দৈনিক দেশবাংলা, সংখ্যা- ১৯১, ২৬ এপ্রিল ২০০৫
মাসিক সত্যপ্রবাহ, ৮ম সংখ্যা, এপ্রিল '০২
দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, বর্ষ ১ সংখ্যা, ১ জানুয়ারী-জুন ২০০৭